নববধূ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

তৃতীয় সংস্করণ
কার্ত্তিক ১৩৫২
সপ্তম সহস্র

—দুই টাকা আট আনা—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীভুবনমোহন
মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীপ্রতিমা মিত্র

কল্যাণীয়াসু—

এই লেখকের—

ভাড়াটে বাড়ী
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
রাত্রির তপস্যা
প্রেরণা
কোলাহল
স্মরণীয় দিন
প্রভাতসূর্য্য
দুর্ঘটনা
সীমান্তরেখা
পুরুষ ও রমণী
রজনীগন্ধা
বহুবিচিত্র
স্বর্ণমুকুর
নবযৌবন
চতুর্দ্দোলা
কমা ও সেমিকোলন
সাবালক
শ্রেষ্ঠগল্প
কাছে আছে যারা
মিলনান্ত
জ্যোতিষী
রাত-মোহানা
পৃথিবীর ইতিহাস

আমার লেখা বিবাহের এবং দাম্পত্য-জীবনের চিত্র-গুলিকে একসূত্রে গেঁথে দেবার জন্য অনেকদিন ধরেই বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে তাগিদ পেয়েছি। এতদিন হয়ে ওঠেনি সে ত্রুটির জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এই সম্পর্কে আর একটা কথা প্রার্থনাও ক'রে রাখি—এর মধ্যে দুটি অংশ এর আগে আমার 'ভাড়াটে বাড়ী' বইতে বেরিয়েছিল কিন্তু একই ধরণের চিত্রগুলিকে একসঙ্গে সাজাতে গিয়ে পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে তাদের এর মধ্যে স্থান দিতে হ'ল। আশা করি পাঠকরা এ অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

বিবাহের পূর্ব্বদিন

বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে শনিবার, শুক্রবার হইতেই বাড়ীতে কুটুম্ব সমাগম শুরু হইয়াছে। পাত্র সুরেশ বহুদিন চাকরী করিয়া টাকা জমাইয়াছে, বিবাহেও অনেক টাকা পাওয়া যাইবে এমনি একটা জনশ্রুতি মুখে মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছিল বলিয়া আত্মীয়রা প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। বাপ-মা নাই, বাড়ীতে অভিভাবক গৃহিনী বলিতেও কেহ নাই, সুতরাং যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দাবী ঐ পদটির উপর।

ছোটমাসী আসিয়াছেন বুধবার রাত্রে, তিনি বার বার সকলকে শুনাইতেছেন, ওরা আমাকে ভুলে থাকতে পারে, আমি কিন্তু কানে শুনে চুপ করে থাকি কি করে বলো দেখি? পেটের ছেলে ত? মা মাসী কি আলাদা? খবরটি যেতেই চলে এলুম, ওরা বলবার আর অপেক্ষা করতে পারলুম না। কাজ যে আমারই, ওরা নেমন্তন্ন করা পর্য্যন্ত কি আর চুপ করে বসে থাকতে পারি?

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন নিজের কন্যাকে, গাড়ী ভাড়ার টাকাটা চেয়ে নিয়ে রাখলি কোথায়? সাবধান করে রেখেছিস্ ত? যা পাঁচভূতের কাণ্ড—

সুরেশরা এই মাসীটিকে চোখে দেখে নাই পর্য্যন্ত, কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ স্নেহের পর অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায় কি?

মামা ভোর বেলায় চার-পাঁচটি পুত্রকন্যাসহ সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন হইতে উপদেশ দিতে শুরু করিয়াছেন, এখনও থামেন নাই। সুরেশকে ডাকিয়া বারবার বলিতেছেন, পিসি ফিসি এত জোটালি কেন? ওরা সব বুঝলি বাবা, সব কেবল খাবার পাত্র আর নেবার পাত্র,—একতিল উপকার কারুর দ্বারা হবার সম্ভাবনা নেই। আর দরকারই বা কি, মামী রয়েছে তোদের মাথার ওপর, মাসীরা রয়েছে, যা কিছু করবার ওরাই করবে। না, না, সুরেশ অনিল, তোমরা ছেলেমানুষী ক'রোনা! এখন থেকে বুঝে চল্‌তে না শিখলে পরে পস্তাতে হবে। পয়সা দুটো না হয় জমিয়েছ, তাই বলে কি বার-ভূতের মধ্যে এমনি করে লুটিয়ে দিতে হবে?

মিনিটখানেক পরেই কন্যাকে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে খাবারটাবার তোরা খেয়েছিস? চা টা পেয়েছিস্ ত? হ্যাঁরে ও সুরেশ, দে না কিছু মিষ্টি টিষ্টি আন্‌তে। তোর সব মামাতো ভাই বোন, মাসতুতো ভাইবোন গুতগুলো এসেছে, হাজার হোক একটা দিন আনন্দ করবে বৈ ত নয়। পয়সা ছাড়্ না কিছু—খেয়ে আর খাইয়ে যে ক'টা দিন যায়। আমি-ত এই বুঝি।

সুরেশ ব্যস্ত হইয়া টাকা বাহির করিয়া দেয়। অনিল রাগ করিয়া আড়ালে গজরায় হয়ত, কিন্তু সুরেশ বলে, যাক্ যাক্—একটা দিন এসেছে আর রাগারাগি করে কাজ নেই—

পিসিমা বাড়ীর কাছেই থাকেন। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী সুদ্ধ

তাঁহার সংসারে মোট পাঁইত্রিশটি—তিনি আসিয়া কহিলেন, আমার বাড়ীতে রান্না-বান্নার পাট এ দুটো দিন বন্ধ রাখলাম বাবা, আমি আর বড় বৌমা দুজনকারই এখানে থাকা দরকার, নইলে সব করবে কে? তোরা আতান্তরের মধ্যে পড়বি আর আমি বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌ব সে-ত হয় না। মামাই বল আর মাসীই বল বাবা সুরেশ, সব ত আজ দেখছি—আমি যে বাবা চিরকালের। দাদা বৌদি যখন পনেরো দিনের আড়াআড়িতে মারা গেলেন, তখন ঐ অনিলকে মাই দিয়ে মানুষ করতে হয়েছে যে আমাকে। বাপ্‌রে! সে দিনের কথা কি ভুলতে পারি! মনে করলেও মনটার ভেতর কেমন করে ওঠে। হ্যাঁরে সুরেশ, সে-সব কথা তোর কি মনে পড়ে বাবা, ভোরবেলা উঠে তুই বলতিস্ 'পিসি, জিবেগজা দে' আর অনিল পিসি বলতে পারত না, বল্‌ত 'হিসি'—

সুরেশের মনে আরও অনেক কথাই পড়িল কিন্তু সে কথা এখানে বলা চলে না, সে উত্তর দিল, মনে পড়ে বৈকি পিসিমা, তা বেশ ত, এরা কদিন এখানেই খাওয়া দাওয়া করুক না, তোমার আর বড় বৌদির ত বাড়ী যাওয়াও হবে না। এ ক'দিন তোমাদের এখানে থাকা দরকার।

আড়ালে অনিলকে ডাকিয়া কহিল, আরও সের-দেড়েক মাছ চাই বোধ হয়। ভাগ্যিস একটা ঠাকুর বেশী আনা হয়েছিল।

পিসিমার কন্যা নন্দরাণী কহিল, কি কাপড় চোপড় সব কিন্‌লি, কৈ দেখালি না ত সুরু? দেখি না একবার।

সুরেশ নিজেই গিয়া দেখাইতে বসে, গাত্র-হরিদ্রার রকমারি বাজার, কাপড়গুলি ছাড়া সমস্তই সে নিজে কিনিয়াছে। মেয়েদের কাপড় অনিল ভাল কিনিতে পারে এইরূপ একটা খ্যাতি ছিল বলিয়া সে তার

ছোট ভাইয়ের উপরেই দিয়াছে। তা অনিল কাপড় কিনিয়াছেও বড় চমৎকার—চাঁপ'ফুল রঙের বেনারসী, গঙ্গাজলি গরদ, আসমানী রঙের ঢাকাই, জংলা সিল্কের কাপড়, কালো জমির উপর সোনালী জরির কাজ করা মাদ্রাজী, ময়ূরকণ্ঠী, চাঁদের আলো, টিয়াপাখীর রং—নানা বর্ণের এবং মূল্যের বিচিত্র কাপড়। সে দিকে চাহিয়া চাহিয়া নন্দরাণীর দৃষ্টি সাপের চোখের মতই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তবুও সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, তা বেশ হয়েছে, আবার কি! এ'ত বেশ ঘটার গায়েহলুদের মতই বাজার হয়েছে।...আবার তারা কি সব দেয় ভাখো—

মানসচক্ষে এমনিই আরো কতকগুলি ফুলশয্যার জিনিষ কল্পনা করিয়া নন্দরাণী যেন অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, ও ঢাকাইখানার কত দাম নিয়েছে রে অনিল?...ষোল? বাব্বা! আমার অমনি একখানা ঢাকাই পরার সথ অনেক দিনের, কিন্তু আমাকে আর কে দেবে বল্—

সে উঠিয়া বাহিরে গেল। কিন্তু সুরেশ সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। একদৃষ্টে প্রসাধন দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল যে এই সব নৈবেদ্য সে যাহার জন্য পাঠাইতেছে সে কেমন কে জানে? সুরেশ নিজে মেয়ে দেখে নাই, শুনিয়াছে সে সুন্দরী! ঠিক কি রকমটি সুন্দরী কল্পনা করিতে না পারিয়া আবছায়া এক তরুণীকে মনে মনে রূপ দিবার চেষ্টা করে। আজও সেই চেষ্টা করিতে করিতেই ভাবিতে লাগিল যে, সেই সুন্দরী কিশোরীটিও কি আজ নির্জ্জনে বসিয়া তাহার কথাই চিন্তা করিতেছে?

তাহার দিবা-স্বপ্নে রূঢ়ভাবে আঘাত দিলেন পিসিমা, ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কহিলেন, তোর মামার কি আক্কেল রে সুরু? চাকরটা যেমন খাবার নিয়ে বাড়ী ঢুকল, চ্যাঙ্গারীটা সুদ্ধ তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের আর তোর মাসীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিলে, আমার ঐ কুঁচো নাতী-নাতনীগুলো পাশে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়, তবু তাদের হাতে দিলে না। ওমা কি পিচেশ গো!...বাইরে গিয়ে ভাখ্ বাবা সুরেশ, তোর মামী বোধ হয় নিজে গোটা-ষোল রসগোল্লা একটা ডিসে নিয়ে খেতে বসেছে—

সুরেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, যাক্‌গে পিসিমা, আজকের দিনে আর ও সব কথা তুলে কাজ নেই—আমি আরও খাবার আনিয়ে দিচ্ছি—

কিন্তু সে বাহিরে যাইতেই মামা ডাকিয়া বলেন, বাবা সুরেশ, এমন করলে তুমি পারবে কি করে? ঠাকুর যত মাছ সাঁতলে তুলছে সমস্তই তোমার পিস্‌তুতো ভাইরা চেয়ে নিয়ে নিজেদের ছেলেপিলেকে খাইয়ে দিচ্ছে। তারপর এই বাড়ীসুদ্ধ লোক ভাত খাবে কি আঙুল ঠেলে?

সুরেশ মনে মনে ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি? সে কোন মতে একটা জবাব দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। এমন ব্যাপার হইবে জানিলে সে হয়ত কাহাকেও সংবাদ পর্য্যন্ত দিত না।

বড় মামাতো ভাই আসিয়া বলেন, তোরা ডাকবি না, আমার ওপর কোন ভার দিবি না, তা আমি কি করব বল্? পাড়াসুদ্ধ লোক আমাকে বাজার করবার জন্যে ডেকে নিয়ে যায় অথচ তুই ভার দিলি অনিলের ওপর। কাপড়গুলো কিনতে যে টাকা ও খরচ করেছে, ওর অর্দ্ধেক দামে আমি পেতুম—

শেষ কথাটা অনিলের কানে গেল। সে বলিয়া উঠিল, ঐ বেনারসী খানার দাম কত বলুন দেখি—খুব-ত কাপড় কেনেন ?

অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি জবাব দিলেন, তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ পঁচাত্তর টাকা নিয়েছে, না ?

অনিল কহিল, আপনি হ'লে কতয় আনতে পারতেন ?

তিনি জবাব দিলেন, আমি ?—আমি হ'লে হয়ত পঁয়ষট্টি টাকাতে পেতুম।

অনিল কহিল, আমি পঞ্চান্ন টাকায় কিনেছি। দাদার কাছে রসিদ আছে, দোকানের ঠিকানাটা জেনে নেবেন !

সে আর দাঁড়াইল না। কিন্তু বড়দা' রাগে আগুন হইয়া কহিলেন, দেখলি কথার ছিরি ? বেনারসী কাপড় সব সময় বোঝা যায় না—কিন্তু দেখি সব বাজারের হিসেব, আমি যদি সিকি দামে কিনতে না পারি ত আমার নামই নেই।

সুরেশ তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিয়া কহিল, কেন ওর কথা শোনেন ? ওকে কি জানেন না ?

সে সরিয়া পড়িল আর একটা ঘরে। সেখানে নান্দীমুখের সমস্ত বাজার, পূজার উপকরণ সব এক জায়গায় রহিয়াছে, তাহারই মধ্যে এক বিধবা আত্মীয়া কি যেন করিতেছিলেন। সুরেশের পায়ের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, দেখছিলুম সব এসেছে কি না—তা অনিল আমার খুব হুঁশিয়ার ছেলে, কিছু ভুল করেনি !

সুরেশ পিছন ফিরিতেছিল, তিনি ডাকিয়া কহিলেন, ভাখ্ বাবা সুরেশ, একটা কথা বল্‌ব রাখতে হবে।

তাহার পর তিনি কণ্ঠস্বর আর একটু মধুর করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—আমার মেয়ে এই প্রথম তোর বাড়ী এসেছে, যাবার সময় অমনি একখানি ময়ূরকণ্ঠি রঙের ফরাসডাঙ্গার শাড়ী কিনে দিতে হবে, ওর বড্ড সখ—

সুরেশ জবাব দিল, নিশ্চয়ই দেব ! দেব বৈকি, যাবার সময় সকলকেই দিতে হবে যে !

সেজ পিসিমা বাড়ীর গৃহিনী-স্বরূপ হইয়া ছিলেন কিছুদিন যাবৎ, তিনি সুরেশকে ডাকিয়া ফিস-ফিস করিয়া কহিলেন, তত্ত্বর জিনিষগুলো যে ঘরে আছে সে ঘরে একটা চাবি দিয়ে দে—

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলে, কেন ? সবাই দেখছে—এখন চাবী দেওয়া কি ঠিক হবে ?

মুখখানা বিকৃত করিয়া তিনি জবাব দেন, দেখছে বলেই ত বলছি। ওর কি কিছু থাকবে মনে করছিস ? না ঐ অত খুচরো জিনিষের কোন হিসেব আছে ?......কার মনে কি আছে তার ঠিক কি ?

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বড় মাসী আসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, কি সব তত্ত্বের জিনিস পত্তর কেনা হয়েছে দেখলাম না ত !

সেজপিসি বলেন, দেখবে বৈকি ভাই, তোমরা দেখে শুনে আহ্লাদ করবে বলেই ত একটি জিনিষও আমি তুলতে দিইনি। সব সাজিয়ে রেখেছি—চল, চল, দেখবে চল।

তিনি জোর করিয়া বড় মাসীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। সুরেশ কিছুক্ষণ তাঁহাদের অপস্রিয়মান গতির দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যেন কিছুতেই তাহার মাথায়

ঢুকিতে চাহিল না। অনিল যখন একেবারে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার খেয়াল হইল। সে প্রশ্ন করিল, কী রে?

অনিল কহিল, টাকা আমার হাতে আর একটিও নেই। সকাল থেকে জলখাবার আনালুম বারো টাকার ওপর—তারপর ছত্রিশবার শুধু বাজারে পাঠাতে হচ্ছে! আমি চল্লুম কারুর বাড়ী, তোমার যা খুশী হয় কর্‌রো।

সুরেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, টাকার দরকার থাকে নিয়ে যা, কিন্তু তুই গেলে কে দেখবে এসব? ওসব আমি একেবারেই সামলাতে পারব না। এই নে, কুড়িটা টাকা রাখ।

সেখান হইতে সে একেবারে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় তাহার নিজের বাড়ী হইতে খান-তিনেক বাড়ী পরে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটা রকে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বন্ধু অসিত অফিস যাইতেছিল, সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, কিরে বুক দুর-দুর করছে, না? সবাইকারই এক অবস্থা, আমারও ঐ রকম শুরু হয়েছিল দিন সাতেক থেকে! আবার কাল দেখ্‌বি কি রকম মনে হয়—

সে চলিয়া গেল, কিন্তু সুরেশ ভাবিতে লাগিল, সত্যই-ত, তাহার বক্ষে এ কিসের কম্পন! ভয় নহে, লজ্জা নহে, এই সমস্ত অনুভূতির অতীত কী এক আবেগ তাহার সমস্ত বুক দুরু দুরু কাঁপাইতেছে। সে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না—

দূর মাঠের ওপারের গেরুয়া রঙের বাড়ীটার দিকে চাহিয়া সে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ঐ শাড়ীগুলির কোন্‌ খানিতে নব-বধূকে সবচেয়ে মানাইবে। চাঁপাফুল রঙের বেনারসী কাপড়খানি

এক গৌরী কিশোরীর সুঠাম সুন্দর তনুলতা বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছে, তাহার আয়ত চক্ষু দুটি অপরিসীম লজ্জায় নত, মুখে আনন্দ, আশা ও লজ্জার হাসি। মানসচক্ষুতে এ দৃশ্য কল্পনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই যে সুন্দরী বধূ যাহার জন্য এখানে এবং সেখানে নানা প্রকার অনুষ্ঠান ও অভ্যর্থনার আয়োজন চলিয়াছে, সেই তরুণীটি তাহারই—একান্তভাবে তাহার হইবে। তাহাকে ভালোবাসিবে, তাহার জন্য ভাবিবে, ছোটখাট সহস্র সেবাযত্নে তাহাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিবে; স্নেহে, প্রেমে, আদরে, আবদারে তাহার জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। কিন্তু এসব কি সত্য? তাহার অদৃষ্টেও কি এই অসম্ভব সম্ভব হইবে? কে জানে…

বুকের মধ্য হইতে বিবর্ণ এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া সুরেশ আর একবার ভাল করিয়া দেখিল।

হাতের লেখা কেমন দেখিবার জন্য অনিল মেয়ে দেখিতে গিয়া একটা কাগজে দুই ছত্র লিখাইয়া আনিয়াছিল—এ সেই কাগজখানা। লিখিবার সময় হাতের ঘাম লাগিয়া বোধ হয় কাগজটা ভিজিয়া গিয়াছিল, তাহারই কিছু চিহ্ন তখনো রহিয়াছে। সেই স্বেদ-চিহ্ন এবং কম্পিত হস্তাক্ষরের মধ্য দিয়া সুরেশ যেন সেই ভীরু মনটির অনেকখানি দেখিতে পাইল। বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কাগজটি সে আবার সযত্নে ভাঁজ করিয়া বুকের মধ্যে রাখিয়া দিল। ইচ্ছা আছে ফুল-শয্যার রাত্রে এই কাগজটি অরুণাকে দেখাইবে। মনে মনে তাহার সলজ্জ স্মিত মুখখানি কল্পনা করিয়া আপন মনেই সে হাসিয়া উঠিল।

সেজ পিসির ছেলে নরেনের ডাকাডাকিতে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। নরেন আসিয়া কহিল, বড়দা, মা আপনাকে ডাক্‌ছে, শিগ্‌গীর!

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন, কি হয়েছে রে?

নরেন মুখটা বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আপনার ছোটমাসীমা রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন—

সুরেশ তখনই ছুটিয়া ভিতরে গেল। সকলে একসঙ্গে কারণটা বোঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই কলরব এবং মাসীমার অজস্র অশ্রুজলের মধ্যে যে সংবাদটি পাওয়া গেল, তাহা সংক্ষেপে এই যে—মাসীমা এখানে কন্যা-জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই ভগ্নী কে, কবে তাহার বিবাহ হইয়াছে এবং কোথায় তাহার শ্বশুরবাড়ি, কোন সংবাদই তাহারা রাখিত না বলিয়া প্রথমে অনিল তাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে সম্মত হয় নাই। তখন সুরেশই অনিলকে অনেক করিয়া রাজী করে এবং নিজে একখানা চিঠি লিখিয়া নরেনের হাত দিয়া নিমন্ত্রণ করিতে পাঠায়। সম্প্রতি সেই ভগ্নিটি পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে এই ধরণের নিমন্ত্রণে নাকি তাহার স্বামী অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার যাওয়া অসম্ভব!

মাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, জামাই যেখান থেকে অপমান হলেন সেখানে ত একটি দণ্ডও আমার থাকা উচিত নয় বাবা, এর পরে আমি জামাইয়ের কাছে মুখ দেখাব কি করে? না বাবা সুরেশ, আর আমাকে অনুরোধ ক'রো না।

অনিলের দিকে চাহিতে সে রাগ করিয়া জবাব দিল, এর চেয়ে ভাল

ক'রে নেমন্তন্ন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তারা আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল কখনও?

সুরেশ বিব্রত হইয়া কহিল, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, আপনি স্থির হোন মাসীমা, আমি যেমন ক'রে হোক্ আপনার জামাইকে এনে দিচ্ছি—

সে জামাটা কাঁধে ফেলিয়া তখনই বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেজপিসি রাগ করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, এত আধিখ্যেতা কোথাও দেখিনি বাবা! তাকে পায়ে ধরে না নিয়ে এলে মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হ'য়ে গেল! এইত আমার নাত-জামাই, একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলুম—তারা সব্বাই এসে হাজির হ'ল নিজেরাই—কই, একটা কথাও-ত বললে না?

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তারা এসেছে নাকি সব?

সগর্ব্বে পিসিমা জবাব দিলেন, আসেনি আবার, সব্বাই এসে গেছে, ঐ ছ্যাখ্ না বেরিয়ে—

সুরেশ আর দেখিল না, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

ট্রামে উঠিয়া ভগ্নিপতির বাড়ীর উদ্দেশে যাইতে যাইতে এক জায়গায় তাহার কানে গেল দূরাগত সানাইয়ের সুর। অকস্মাৎ সমস্ত পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইয়া তাহার মন আবার এক স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গেল। সেখানে শুধু চোখে পড়ে ব্রীড়াবনতা, সলজ্জা এক কিশোরী সখীদের পরিহাসে বিব্রত হইয়া মুখ নীচু করিয়া হাসিতেছে—আনন্দ ও লজ্জার অপূর্ব্ব এক রঙ্ তাহার গণ্ডে।

সুরেশ স্থির করিল প্রয়োজন হইলে সে ভগ্নিপতির পায়ে পর্য্যন্ত ধরিবে, তবু কাহারও মুখ সেদিন বিষণ্ণ হইতে দিবে না।

সমারোহ

শ্যামলী অতি কষ্টে বাসর-ঘর হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে তখন কোলাহল কমিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় নাই। অত রাত্রেও বাহিরের মঞ্চ হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় বখ্‌শীষের লোভ একটু বেশীই দেখানো হইয়াছিল। ঠাকুরদের কাজও শেষ হয় নাই, তখনও পরিবেশক এবং আত্মীয়দের খাওয়া বাকী।

কিন্তু এইসব সমারোহের যে কোন অর্থই আর শ্যামলীর কাছে ছিল না। সে বরং তখন একটু নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচে। একটা সুগভীর ক্লান্তি, অতিরিক্ত উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে ক্লান্তি মানুষ অনুভব করে, যেন তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সে বারান্দার অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণে একটা থামে মাথা দিয়া চোখ বুজিয়া দাঁড়াইল। এই নির্জ্জনতা, এতটুকু একটু ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য তাহার সমস্ত অন্তর এতক্ষণ লালায়িত হইয়াছিল।

অথচ তাহার ক্লান্তি অনুভব করিবার কথা নয়। সতেরো আঠারো বছর বয়স তাহার, বাপের একমাত্র আদরিণী কন্যা সে। আশুবাবু

অনেক খুঁজিয়া রূপবান, সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পাত্র বাছিয়া আনিয়াছেন, এমন সুপাত্র অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়, একথা সকলেই জানাইয়া গিয়াছে শ্যামলীকে। খরচের কোন ত্রুটি হয় নাই। সমারোহ আড়ম্বরের কোন অভাব না থাকে সেদিকে আশুবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, এমন কি এই ব্যাপারে তাঁহার স্ত্রীর সহিত বচসাও হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, কন্যার তরফ হইতে নব পরিণয়ে যে সকল কারণে উৎসাহহীনতা থাকে, সে সব কারণও শ্যামলীর ছিল না। আশুবাবু কন্যাকে স্কুলে পর্য্যন্ত যাইতে দেন নাই, চিরকাল সযত্নে এবং সাবধানে মানুষ করিয়াছেন—আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি যাতায়াতও বিশেষ ছিল না তাহাদের, সুতরাং পূর্ব্বরাগ-অনুরাগের কোন সুযোগই তাহার মেলে নাই। খোলা মনে, আকুল কামনায় স্বামীকে বরণ করিবারই কথা তাহার।

তবে ?

এ তবের জবাব শ্যামলী নিজেই পায় নাই। এ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। এতগুলি বিপরীত ও বিভিন্ন অনুভূতি তাহাকে অকস্মাৎ আঘাত করিয়াছে যে, তাহার চিত্ত এখনও পর্য্যন্ত কোথাও কোন স্থিতিই খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অথবা ব্যাপারটি কিছুই নয়। পুকুরের ওপারে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কয়েকটি ছাত্র মেস্ করিয়া থাকে, সকলকারই অল্প বয়স, বাল্যের চপলতা এখনও তাহারা ভোলে নাই। কারণে অকারণে হল্লা করে, স্নান করিতে নামিয়া পুকুরে মাতামাতি করে, সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত খুনসুটি করে এবং যে কোন সামান্য ছুতায় হাসিয়া আকুল হয়। ইহাদের সহিত কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় শ্যামলীর থাকা সম্ভব নয়, ছিলও না। সে শুধু নিজের

শয়নঘরের জানালা হইতে পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া তাহাদের ছেলেমানুষী দেখিয়া আনন্দ পাইত। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চল যে ছেলেটি, নির্ম্মল, সে ললিতকে সাঁতার শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই সূত্রে তাহার নামটা শ্যামলীর জানা ছিল, বাকী কাহারও নাম পর্য্যন্ত সে জানিত না। নির্ম্মল ছেলেটি নাকি লেখাপড়াতেও ভাল; বছর একুশ বয়স, শ্যামবর্ণের বলিষ্ঠ গঠনের দেহ তাহার—এইটুকুর বেশী তাহার সম্বন্ধেও শ্যামলীর কিছু জানা ছিল না।

সহসা ঘনিষ্ঠতা হইল এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই। আশুবাবু বিবাহে নিমন্ত্রিতদের যে ফর্দ্দ তৈয়ারী করিতেছিলেন, একদিন সেদিকে নজর পড়ায় শ্যামলীই বলিয়াছিল, বাবা, পাড়ার সব বাড়িই যখন ফর্দ্দে ধরলে তখন ও বাহান্ন নম্বরটা বাদ দিলে কেন?

বাহান্ন নম্বর? মানে ঐ মেস্‌টা? ওদের সঙ্গে ত আমাদের তেমন যোগাযোগ নেই, সেই জন্যেই—বছর বছর নতুন ছেলেরা আসে, সবাই অপরিচিত। সামাজিক ব্যাপারে ওদের ডাকা কি ঠিক হবে মা?

শ্যামলী মাথা নীচু করিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষই-বা কি বাবা? বেচারীরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসে এখানে পড়ে আছে, কতকাল ভাল ক'রে খেতে পায়নি। রান্না করে ত ঐ উড়ে ঠাকুর, ওর আর দৌড় কত?

শ্যামলীর মা-ও সায় দিয়া বলিয়াছিলেন, তা বটে বাপু, মায়ের বাছারা কি কষ্ট ক'রেই পড়ে আছে এখানে! না পায় ভাল খেতে, না আছে একটা যত্ন করার লোক। তোমার ত সাত শ' লোক খাবে, তার মধ্যে আরও কুড়ি-পঁচিশ জনের এমন কি বেশী খরচ পড়বে—

নিমেষে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া আশুবাবু বলিয়াছিলেন, ঠিক ঠিক,

ও কথাটা আমার মনেই ছিল না। আমি নিজে গিয়ে বলে আসব ওদের। ফর্দ্দে ওদের নামগুলো না ধরা আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ঐ জন্যেই ত আমার মা-মণিকে প্রত্যেক কথা জিগ্যেস ক'রে নিই—

ঐ পর্য্যন্ত। তাহার পর আর সে কথা শ্যামলীর মনেও ছিল না।

একেবারে বিবাহের দিন সে তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এ পাড়ায় দু'একজন তরুণ ছাত্র ছাড়া বাকী সকলেই মেসের ছেলেদের এড়াইয়া চলিত। আজ সহসা আশুবাবু তাঁহার কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করাতে তাহাদের উৎসাহের সীমা রহিল না। তখনই তাহারা স্থির করিয়া ফেলিল যে, ভদ্রলোক যখন এতখানি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তিনি যাহাতে কোন রকমে না অপদস্থ হন তাহা দেখা তাহাদেরই কর্ত্তব্য। আর সেই সিদ্ধান্তের ফলেই তাহারা সেদিন উপযাচক হইয়া অপরাহ্ণেই আসিয়া হাজির হইল এবং নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া কাজে লাগিয়া গেল।

আর বাস্তবিক ছেলেগুলি খাটিতে পারে! আশুবাবুর লোকাভাব যথেষ্টই ছিল, সে জন্য তাঁহার উদ্বেগেরও সীমা ছিল না; কিন্তু এখন এই ছেলেগুলিকে পাইয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গেলেন। বাড়ির ছেলেপুলেদের মতই নিজেরা বুঝিয়া সাধিয়া কাজ করিতে লাগিল তাহারা, আর সংখ্যাতেও ত কম নয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ জন; সুতরাং আশুবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া শুধু অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শ্যামলী অবশ্য অপরাহ্ণের বহু পূর্ব্বেই আটকা পড়িয়াছিল একটা

ঘরে, তবু ইহাদের সব খবরই তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ইহাদের এই পরিশ্রম এবং আন্তরিকতাকে সে তাহারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধা-স্বরূপে মনে মনে গ্রহণ করিয়া একটু খুশীও হইয়াছিল বই কি! বিশেষ করিয়া ঐ নির্ম্মল ছেলেটি, সে যেন একটা মানুষ দশটা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। যে-ঘরে শ্যামলী বসিয়াছিল, তাহারই সামনের বারান্দা দিয়া একতলা হইতে তিনতলায় যাইবার পথ; সেইখান দিয়া অনবরতই যাতায়াত করিতেছিল নির্ম্মল। তাহার ঘর্ম্মাক্ত মুখ এবং দ্রুত নিঃশ্বাসের বক্ষ আন্দোলন দেখিয়া শ্যামলীর মন মমতা ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। বহু লোক চারিদিকে- শ্যামলী তাহারই মধ্যে, অসংখ্য পদধ্বনির মধ্য হইতে সেই বিশেষ পদধ্বনিটি বাছিয়া লইয়া বার বার গোপনে নির্ম্মলকে দেখিতেছিল। শ্যামলীর দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর নির্ম্মলের ছিল না, তা না থাক—কিন্তু তাহার এই কর্ম্ম-ব্যস্ততা—সে ত শ্যামলীকেই উপলক্ষ্য করিয়া! সে জন্য সে মনে মনে যেমন গর্ব্বও অনুভব করিতেছিল, তেমনি তাহার অনুতাপেরও সীমা ছিল না; আহা, বেচারীদের খাওয়াইবার জন্য ডাকিয়া কত কষ্টই দেওয়া হইল!

তাহার পর সহসা এই নির্ম্মল ছেলেটি কেমন করিয়া যেন একেবারে তাহার ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে-ও একটা অতিরিক্ত কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে, চারিদিকে হৈ-চৈ যখন সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; শ্যামলীর জীবনের সেই চরম মুহূর্ত্তে লজ্জায় ভয়ে সে তখন অভিভূত, কোন অনুভূতিই তীব্রভাবে বোধ করিবার সময় সেটা তাহার নয়—তবু, তবু কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে সে সময় তাহার বুক ঐ ছেলেটিকে উপলক্ষ্য করিয়াই দুলিয়া উঠিয়াছিল।

কারণ ?

কারণটা যেন মনের মধ্যে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। শ্যামলী অতি কষ্টে মনে করিবার চেষ্টা করিল। হ্যাঁ, সেটা সম্প্রদানের সময়েই বটে।

তখন বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ছাঁদনা-তলায়।

এইবার ক'নেকে প্রয়োজন। কিন্তু পিঁড়িসুদ্ধ ক'নেকে তুলিয়া আনিবে কে ? তেমন কোন আত্মীয় ছিল না শ্যামলীর। একটি মাত্র দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতি ছিলেন, আর যে সব মামাতো পিসতুতো ভাই ছিল, সকলেই ছোট ছোট। আশুবাবু একবার ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, তাই ত, কে আনে এখানে !…আবার সাত পাক ঘোরানো।

নির্ম্মল কী একটা কাজে উপরে যাইতেছিল, কহিল, আমি ধরলে কোন আপত্তি হবে না ত ? শুনেছি বিবাহিত আত্মীয়দেরই ধরতে হয়।

ভগ্নিপতি সুরেশবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তুমিও যেমন ! অত বাছতে গেলে আর কাজ চলে না। বিশেষ এখন আর অন্য লোক কই ?……

অগত্যা নির্ম্মলই সুরেশবাবুর সঙ্গে গেল। সুরেশবাবু কহিলেন, পারবে ত দুজনে ? না, আর কাউকে ডাকব ?

নির্ম্মল নিজের ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ বাহুর দিকে একবার চাহিয়া লইয়া জবাব দিল, কিছু দরকার নেই।…

নির্ম্মল ধরিল সামনের দিকে, সুরেশবাবু পিছনে। সহসা সেই বিশেষ মুহূর্ত্তে কী রকম একটা গোলমাল হইয়া গেল। শ্যামলীর বুক আজ এই প্রথম কাঁপিয়া উঠিল। সে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না সত্য কথা,

তবু নির্ম্মলকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। চারিদিকের কোলাহল, আলোক-সজ্জা, অসংখ্য উৎসুক চোখের দৃষ্টি—কোনদিকেই শ্যামলীর আর লক্ষ্য রহিল না। সুধু বলিষ্ঠ, স্বেদসিক্ত, শ্যামল একটি হাতের দিক হইতে সে যেন আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। ভারী জিনিস ধরিয়া থাকার জন্য শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরেই জমিয়াছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ একবার সেই হাতখানি স্পর্শ করিবার ইচ্ছা শ্যামলীর মনে উগ্র হইয়া উঠিল। একবার সে ঐ কব্জির উপরটা চাপিয়া ধরিবে, একবার শুধু, আর কিছু নয়। কিন্তু—চারিদিকে অসংখ্য লোক, আর তা ছাড়া নির্ম্মলই বা কি মনে করিবে? না, সে সম্ভব নয়।

কিন্তু সম্ভবই হইয়া পড়িল—একটু পরেই। সুরেশবাবুর ডান হাতটা একটু কাঁপিয়া একদিকের পিঁড়িটা হেলিয়া পড়িল। তাঁহার অনভ্যাসের জন্যই হউক, আর শ্যামলীর নাড়িয়া বসিবার চেষ্টাতেই হউক—ফলে শ্যামলী পতনের সম্ভাবনাতে দিশাহারা হইয়া নির্ম্মলেরই একটা হাত চাপিয়া ধরিল। সে এক মুহূর্ত্ত, কি আরও কম। পরক্ষণেই শ্যামলী দারুণ লজ্জায় হাতটা ছাড়িয়া দিয়া মাথা আরও হেঁট করিয়া বসিল। সুরেশবাবুও ইতিমধ্যে সামলাইয়া লইয়াছিলেন—প্রয়োজনও আর ছিল না। এ একটা অতর্কিত, আকস্মিক ঘটনা, দুই-একটি মহিলা, যাঁহারা কাছেই ছিলেন, তাঁহারা ছাড়া আর কেহ লক্ষ্যও করিল না; কিন্তু একটি মুহূর্ত্তের সেই ঘটনা—পিচ্ছিল, তপ্ত, কঠিন একখানি হাতের স্পর্শ সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা আবেগে শ্যামলীর সমস্ত অনুভূতিকে যেন বিবশ, বিহ্বল, করিয়া দিল!

সে বিহ্বলতা ভাল করিয়া কাটিবার পূর্ব্বেই শুভদৃষ্টির সময় আসিয়া পড়িল। সকলে চারিদিক হইতে উপদেশ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নাপিত ছড়া কাটাইতে লাগিল, তাহারই মধ্যে কানে কানে সখিস্থানীয়া কে বলিল, ভাল করে চেয়ে দেখ্ লো—দেখবার মত বর!

চোখ লজ্জায় বুজিয়া আসে, তবু চাহিতে হইল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, লম্বা-চওড়া চেহারার একটি ভদ্রলোক, দেখিলেই সম্ভ্রম আসে মনে। সাধারণ হিসাবে সুপুরুষই বলিতে হইবে। কিন্তু তবু, স্বামীকে দেখিবার পরও, শ্যামলী মনে কোন উৎসাহ বোধ করিল না, বরং যেন একটা সুগভীর ক্লান্তিই অনুভব করিতেছিল সে—নির্জ্জনে কোথাও বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচে। যদিও সে-বিশ্রাম সে পাইল না, বিবাহের নানা অনুষ্ঠানের ঘূর্ণাবর্ত্তে একটা কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িল। এমন কি, বাসরঘরে গিয়াও নিস্তার নাই, চারিদিক হইতে আত্মীয়ার দল ঘিরিয়া রহিল। পরিহাসে ও উচ্ছলতায় সকলে মশগুল—সে সব রসিকতার কোন মূল্য, এই আনন্দ উৎসবের যে নায়িকা, তাহার কাছে আছে কিনা, দেখিবারও কাহারও অবসর নাই।

শ্যামলী সে ঘূর্ণাবর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। নির্জ্জনে যাইবার চেষ্টা সে প্রথমে করিয়াছিল খানিকটা, পরে একেবারেই দিয়াছিল হাল ছাড়িয়া। তারপরে যখন সে ছুটি পাইল, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজে, উৎসবের কোলাহল অনেকটাই তখন কমিয়া আসিয়াছে। শ্যামলী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নীচের দিকে যতটা দৃষ্টি যায় দেখিয়া লইল, তখনও ভোজনের পাট শেষ হয় নাই একেবারে, তবে অনেকটা কম পড়িয়াছে বটে। ও-ধারে যাহারা আহারে বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে

পরিবেশকের ও কর্ম্মকর্ত্তাদের দলই বেশী। সে-দলে মেসের ছেলেরাও অনেকে রহিয়াছে, কিন্তু শ্যামলীর উৎসুক দৃষ্টি যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাকে কোথাও দেখা গেল না।

কে একজন বাসর ঘর হইতে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, শ্যামলী ক্লান্তস্বরে তাহাকে বলিল, আমাকে একটু ঠাণ্ডায় দাঁড়াতে দাও কাকীমা, নইলে আর বাঁচব না।

তিনি সহানুভূতির স্বরে, 'আহা বাছারে, সত্যি বাপু, যা গরম, আর ঐ ভীড়ের মধ্যে বেনারসি কাপড় পরে বসা যায়? আচ্ছা, তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে মা—' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই পিতা আসিয়া পড়িলেন। তাহাকে সেই প্রায়ান্ধকার কোণে একা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কে, মা-মণি, কী হয়েছে মা?

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে শ্যামলী উত্তর দিল, কিছু না বাবা। বড্ড মাথাটা ধরেছে—

আরও ব্যস্তকণ্ঠে আশুবাবু কহিলেন, তাইত, তা এ্যাসপিরিন একটা—

না, একটু ঠাণ্ডায় দাঁড়ালেই মাথা ছেড়ে যাবে।

তারপর মুহূর্ত্ত খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার খাওয়া হয়েছে বাবা?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, দূর পাগলী, আমি কি এখন খেতে পারি, একটু মিষ্টি, আর এক গ্লাস ঘোল খেয়েছি। একে এই গরম, তার খাটা খাটুনি, তার ভিয়ানের গন্ধ, খাওয়ার কথা মনে করাও যায় না। তবু

ভাগ্যিস ঐ ছেলেগুলো ছিল—ওরা আর জন্মে তোরই ভাই ছিল মা, নইলে এমন করে কেউ খাটতে পারে না।

মরিয়া হইয়া শ্যামলী প্রশ্ন করিল, ওদের ভাল করে খাইয়েছ বাবা?

আশুবাবু জবাব দিলেন, ওদেরও সব ঐ দশা। তবু জোর করে স্নান করিয়ে এখন বসিয়েছি। দুজন কিন্তু কিছুতে রাজি হ'ল না, তাদের খাটুনিও গেছে বেজায় কি না—নির্ম্মল ছেলেটি ত এক মিনিট বসেনি। নির্ম্মল আর বিজন, ওদের একটু কিছুও মুখে দেওয়ানো গেল না—

আরও কত কি আশুবাবু বকিয়া গেলেন, কিন্তু সে-সব কথা শ্যামলীর কানেই গেল না। তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া যেন স্থির হইয়া যাইবার মত হইল। সে দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া থামে মাথা রাখিয়া নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নির্ম্মল কিছুই মুখে দেয় নাই, কাহারও কোন অনুরোধেও না। সে কি শুধু পরিশ্রম এবং গরমের জন্যই! পরিশ্রম ত অন্য ছেলেরাও কম করে নাই, তবে? তাহারা ত স্নান সারিয়া আসিয়া তবু বসিল—নির্ম্মল একটা মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া চলিয়া গেল কেন?

শ্যামলীর কান-মাথা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের গোপন অন্তঃপুরে যে প্রশ্নটা মাথা তুলিতে চায় তাহার আভাসেও শ্যামলীর ভয় করে। এ-আশা শুধু তাহার দুরাশা নয়, পাপ। হয়ত একেবারে অসম্ভব, সমস্তটাই তাহার কল্পনা—তবু ঐ কথাটাই মনে আনন্দ-বেদনার তন্ত্রীতে বার বার আঘাত করিতেছে—ইহার সহিত কি শ্যামলীর কোন যোগাযোগ নাই? যে এক-মুহূর্ত্তের অতর্কিত স্পর্শের স্মৃতি শ্যামলীর দেহমনকে এখনও মধ্যে মধ্যে অবশ করিয়া দিতেছে,

তাহা কি কোন গোপন অনুভূতিই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই নির্ম্মলের মনে? শ্যামলীর বিবাহ কি কোন ব্যথা জাগাইবে না সেখানে? ঈর্ষাতুর কোন অব্যক্ত বেদনা?...

এ-সব কথা শ্যামলী স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারে না, শুধু যেন বুকটা পিষিয়া যায় গুরুভার কোন্ সংশয়ের চাপে। মনে হয়, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াই যাইবে বুঝি সে। অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল আশুবাবুর কণ্ঠস্বরে, শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে মা? না হয় আমার ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়লি না কেন?

ছি-ছি, এ-সব কি ছাইভস্ম ভাবিতেছে সে! জীবনে যাহার সহিত কোন যোগ নাই, কোন দিন থাকিবেও না, যাহার পরিচয় পর্য্যন্ত ভাল করিয়া জানা নাই, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এ-কোন্ অসম্ভব কল্পনা তাহার। না, সে বাসরঘরেই ফিরিয়া যাইবে।

সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না বাবা, আমি বেশ আছি। আপনি যান্। নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে ত পারবো না, এখনই ওরা এসে টানাটানি করবে—। তার চেয়ে বরং এখানেই একটু থাকি—

পরদিন সকালের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া একটু অবসর পাইতেই শ্যামলী নীচে নামিয়া আসিল। আশুবাবু বহুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর তখন সবে একটু বসিয়া সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়াছেন, তিনি সস্নেহে টানিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন। কহিলেন, বেহাইকে বলে ঠিক করেছি, সেই বারবেলা কাটিয়ে চারটের সময় যাবি একেবারে। ললিতকেও সঙ্গে দেব এখন, কাল বৌ-ভাত খেয়ে পরশু নাগাদ ও ফিরে আসবে।

তাছাড়া, আমি রোজ বিকেলে একবার করে তোর খবর নেব।…মোটে আটদিন ত, কেটে যাবে।

শ্যামলীর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে জবাব দিল না। তখন আশুবাবু অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, জিনিসপত্র অনেক বেঁচেছে—হিসেব ঠিক করতে পারি নি। অনেক জিনিস নষ্ট হবে—

তাহার পর সরবতের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, অবিশ্যি কিছু কিছু এ-বেলা কাজে লাগবে। কাল যারা খাটাখাটুনি করেছিল, তাদের ত খাওয়াই হয়নি বলতে গেলে, এ বেলা তাদের ভাল ক'রে খাইয়ে দেব ঠিক করেছি।…মেসের ছেলেদেরও বলে এসেছি। তাছাড়া, ওদের জলখাবারের জন্য কিছু কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিলুম। আহা, কাল ওরা যা করেছে, তা ভোলবার নয়—আপনার লোকেও অমন করে না।

শ্যামলীর মা আসিয়া দাঁড়াইলেন—হ্যাঁগা, তুমি আবার মাছ কিনতে বলেছ কেন? মাছ ত ঢের রয়েছে।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, হ্যাঁ, তা বটে। তবে ঐ ছেলেদের বললুম কি না আবার! সব বাসি জিনিস খাবে—তাই ভাবলুম……আচ্ছা, না হয় বরং কিছু মাংস আনাও, তাহ'লে তবু মানিয়ে যাবে। কি বলিস, মা?

শ্যামলী সলজ্জভাবে একটু হাসিল। কথা কহিল না বটে, কিন্তু কে জানে কেন, পিতার প্রতি একটা অকারণ কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া গেল। যেন তাহারই কোন্ না-বলা অনুরোধ তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

সে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরের সেই জানলাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও মেসের ছেলেরা সকলে ওঠে নাই। পূর্ব্বদিনের পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। একজন কি দুজন উঠিয়া দাঁতন করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নির্ম্মল নাই, বোধ করি সে এখনও ওঠে নাই।

জানলাটায় অভ্যাসমত সে বসিয়া পড়িল। গত রজনীর সেই একটা গোপন সংশয় এখনও মনকে পীড়িত করিয়া রাখিয়াছে। কথাটাকে সে জোর করিয়া মন হইতে তাড়াইয়া অন্য কথায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিতেছে, কিন্তু মন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাতেই ফিরিয়া আসিতে চায়। এক প্রকারের ক্ষত থাকে, তাহাতে হাত দিলে লাগে, তবু হাত নিজের অজ্ঞাতসারে সেখানেই বার বার পৌঁছায়। শ্যামলীরও সেই অবস্থা। নির্ম্মলের গত রাত্রিতে একেবারে অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যাওয়ার সহিত তাহার বিবাহের একটা যোগা-যোগ ছিল, এই আশার পিছনে যেমন একটা ব্যথা আছে, রঙীন স্বপ্নও একটা আছে। তাহার সেই অসতর্ক আকুল অবস্থার অবলম্বন হিসাবে নির্ম্মলকেই স্পর্শ করা হইতে শুরু করিয়া মন জাল বুনিতে বুনিতে বহুদূরেই যাইতে চায়। কে জানে তাহার আগেরও কোন ইতিহাস আছে কি না; নির্ম্মলের এই প্রাণ-ঢালা পরিশ্রম শুধুই প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি কি না, তাই বা কে জানে?

যদি তা না হয়? শ্যামলীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। আহা, কত দুঃখেই তাহা হইলে সে কাল নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে। শ্যামলীর বিবাহ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য নিজের সমস্ত দুঃখ মনে

চাপিয়া তাহা হইলে কত বড় আত্মনিপীড়নই না সে করিয়াছে! যাহাতে শ্যামলীর কল্যাণ হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে নিঃশব্দে কাজ করিয়া গিয়াছে, সেই কল্যাণে নিজের জীবনটা যে শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া যাইবে, সে কথা সে একবারও ভাবে নাই!

আকুল কান্নায় শ্যামলীর যেন কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে জোর করিয়া চোখ মুছিয়া রাস্তার দিকে চাহিল, পুকুরের দিকে। আচ্ছা, শ্যামলীর সহিত ত তাহার চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই কখনও, তবে? সে যে এই বাতায়নপথে বসিয়া প্রত্যহ তাহাকে লক্ষ্য করে, একথাটি কি নির্ম্মল জানিত? আর তাহা জানিয়াই কি নিঃশব্দে, সবার অগোচরে সেই দুটি চোখের মিনতি সে গ্রহণ করিয়াছে? তাহারই ফল কি এই মর্ম্মন্তুদ অপমৃত্যি?

শ্যামলী আর বসিয়া থাকিতে পারে না। এ-চিন্তা তাহার পক্ষে অন্যায়, এটুকু জ্ঞান হইবার মত বয়স তাহার হইয়াছে। সে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে আর সাহস করিল না, থাকিলেই এই সব ছাইভস্ম চিন্তা শুরু হইবে।

সে নীচের কর্ম্মব্যস্ততা, কোলাহল ও সমারোহের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। সুন্দর স্বামী হইয়াছে তাহার, জীবনের উৎসবমঞ্চের দ্বার তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত, আনন্দের পথ সবে প্রসারিত হইয়াছে। তাহার সৌভাগ্যে চতুর্দ্দিকের সমস্ত আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে আনন্দ ও ঈর্ষার ঢেউ উঠিয়াছে—এই সমস্ত নাটকের ত সে-ই নায়িকা। সে উৎসবের অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

সহস্র কর্ম্ম, বিদায়ের অসংখ্য আয়োজন ও স্নেহের উচ্ছ্বাসের মধ্যে শ্যামলীর একটি কান ও একটি চক্ষু উন্মুখ হইয়াছিল পুকুরের দিকে। স্নান সারিয়া দল পাকাইয়া ছেলেগুলি যে আসিয়া পড়িয়াছে সে সংবাদটা তাহার অগোচরে ছিল না। সে একটু পরে কী একটা ছুতায় আরক্ত মুখে নীচে নামিতেছে এমন সময় আশুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ। তাহাকে দেখিয়াই তিনি যেন ফাটিয়া পড়িলেন, পান্নাকে বললুম বার বার যে এ সব আনাড়ি ঠাকুর দিও না আমাকে, অপদস্থ হতে হবে, তা কিছুতেই শুনলে না, এখন তাই হলো ত!

শ্যামলী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, কী হলো বাবা?

হবে আবার কি! ছেলেরা সব এসে পড়ল, আর আসার অপরাধই বা কি, এধারেও ত দেড়টা বাজে, তার ওপর বলতে গেলে ওদের কাল থেকে খাওয়াই নেই—

শ্যামলী প্রশ্ন করিল, রান্না কি এখনও হয়নি সব?

সব! মাংস এখনো উনুনে। বার নাম এখনও এক ঘণ্টা। ছি ছি, চার-চারটে ঠাকুর এখনও ক'টা লোকের রান্না করতে পারলে না। তাহার পরই দূরবর্ত্তী গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি হাঁক ছাড়িলেন, ওগো, শুনছ!

তিনি কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কী হয়েছে?

আশুবাবু জবাব দিলেন, হবে আর কি! এখনও রান্না হলো না— এদিকে ছেলেরা ত সব এসে পড়ল। অবিশ্যি ওরা বসবে খানিকটা কিন্তু ওদের মধ্যে দুটি ছেলের নাকি অপেক্ষা করার সময় নেই, ওদের এই আড়াইটার মধ্যেই কলকাতা পৌছতে হবে। যা হয়েছে তাই দিয়ে তুমি

একটু ওদের খাইয়ে দাও। পিসিমাকেও বলেছি এই ভেতরের দালানে দুখানা জায়গা করে দিতে। তুমি দাঁড়িয়ে থেকে খাইও বাপু, ওরা কাল জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দেয়নি—

নিজের অজ্ঞাতেই শ্যামলীর মুখ দিয়া বাহির হইল, কে বাবা?

ঐ নির্ম্মল আর বিজন। নির্ম্মলের মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে, খাওয়া নেই একে, তায় ঐ অসম্ভব খাটুনি—

শ্যামলী আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিল। নির্ম্মল তিনটার আগেই চলিয়া যাইতে চায়, একেবারে কলিকাতাতে! তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে! সেকি শুধু উপবাসে আর পরিশ্রমে! সে যে কিছুতেই শ্যামলীর বিদায়ের সময়টা এখানে, এমন কি, এদেশেই উপস্থিত থাকিতে চায় না, একথাটা শ্যামলীর কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহা হইলে শ্যামলীর অনুমান মিথ্যা নয় কিছুতেই, যেটুকু সংশয় ছিল, এই শুষ্কমুখ এবং পলায়নই তাহা নিঃশেষে দূর করিয়া দিল। একটা অসহ্য সুখের আবেগে শ্যামলীর সমস্ত রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পূজা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে, এমন কি, সেখানে হইতেও ফিরিয়াছে কিছু তাহার কাছে, ইহার অতিরিক্ত শ্যামলী কিছু চাহে না। এইটুকু আনন্দই হয়ত বুকের মর্ম্মস্থান অনেকখানি ছিঁড়িয়া, পিষিয়া চলিয়া যাইবে—তবু তাহাই থাক্ শ্যামলীর পাথেয় হইয়া।

হঠাৎ কি একটা কাজে ললিত লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া পড়িল। কহিল, দিদি, এখানে চুপটি করে বসে যে? ও-ঘরে তোকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে—

শ্যামলীর কি মনে হইল, সে ললিতকে ধরিয়া কহিল, খোকা ভাই, আমার একটা কাজ করবি?

ললিত জবাব দিল, করব—কী কাজ বল্।

শ্যামলী কহিল, বাইরের ঘরে নির্ম্মলবাবু বসে আছে, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসতে পারিস—যে কী এত কাজ তার, এত তাড়াতাড়ি কলকাতা যেতে চাচ্ছে কেন? দেখিস, আমার নাম যেন করিস নি। লক্ষীটি—

'আচ্ছা', বলিয়া ললিত আবার ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

উত্তরটা দিতে গিয়া নির্ম্মল কি রকম বিব্রত হইয়া উঠিবে, কল্পনা করিয়া শ্যামলীর হাসি পাইল। তাহার আরক্ত মুখ পর্য্যন্ত সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

একটু পরেই ললিত ফিরিল। অতিরিক্ত ছুটাছুটির ফলে সে তখন হাঁপাইতেছে। তাহারই মধ্যে বলিল, ও-দিদি, উনি আর বিজনবাবু সিনেমায় যাবেন—'এলিটে'। কাল থেকে টিকিট কেনা আছে ওদের। আমাকে দেখালেন—আর বলছিলেন আমায়, 'তুমি যাবে খোকা?'

তাহার পরই শ্যামলীর দিকে চোখ পড়ায় সে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, ও-কি, তোর কি হ'ল দিদি?

শ্যামলী চোখ বুজিয়া কহিল, কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

ললিত চুপি চুপি কহিল, ওরা খেতে বসেছে, কী তাড়া, বাব্বা! আবার তিনটের শো সিনেমা দেখে কোথায় নাকি তাস খেলার কম্পিটিশন আছে, সেখানে যাবে সন্ধ্যেবেলা। ওরা দুজনে ফাইনালে উঠেছে কিনা—

শ্যামলী প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জানলা দিয়া পুকুরের দিকে নজর পড়িতেই সে মুখটা ফিরাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিচে তখন আশুবাবু কাহাকে বলিতেছেন, বলে দেবে গাড়ী বেশ করে ফুল দিয়ে সাজাতে—খরচার জন্যে ভাবনা নেই। আর ঠিক চারটের সময় গাড়ী চাই আমার।

নব-বধূ

অকস্মাৎ নিচের তলা হইতে তুমুল ঝগ্‌ড়ার আওয়াজটা আসিতে ইন্দিরা যেন বাঁচিয়া গেল। সকলেই হুড়-হুড় করিয়া নিচে নামিয়া যাইতে সে এতক্ষণে একটু একা থাকিতে পারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

বাড়ীতে পা দিবার সময়ই সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন, তবু তখন গুরুজনরা দলে ভারী ছিলেন বলিয়া ছোটরা ঘেঁসিতে পারে নাই। তাঁহাদের দৃষ্টির পরীক্ষাটাই চলিয়াছিল বেশী, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মৃদু মন্তব্য; কিন্তু কড়ি-খেলা প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট ছোট দেবর-ননদ ভাগ্নে-ভাগ্নী ভাসুরঝি প্রভৃতির দল যে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত একটু নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ দেয় নাই। তাহাদের প্রশ্ন চলিয়াছে অবিরাম, তাহার অধিকাংশই হয়ত ছেলেমানুষী, কিন্তু তবু তাহার সবগুলির উত্তর দিতে গেলে বিব্রত হইতে হয়।

ইন্দিরা উঠিয়া গিয়া বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইল। কী বিশ্রী অবস্থাটাই হইয়াছে তাহার! ভারী বেনারসী কাপড়টা এখনও ছাড়া হয় নাই। একে গরম তায় এত লোকের ভীড় তাহার উপর এই

কাপড়, ফলে অনবরত ঘামিয়া তাহার সমস্ত দেহ যেন ফ্যাকাশে হইয়া চুপ্‌সাইয়া গিয়াছে। ভিতরের সাদা বডিসটা ত ভিজিয়াছেই, উপরের সিল্কের জামাটা পর্য্যন্ত সপ্‌সপে হইয়া উঠিয়াছে। কপালের চন্দনচিহ্ন অধিকাংশই ধুইয়া গিয়াছে, অযত্নরচিত কবরী হইতে অনেকগুলি চুল মাথায় কাপড় দেওয়ার অনভ্যাসজনিত টানাটানিতে, নামিয়া আসিয়া কপালময় জড়াইয়া রহিয়াছে। তা ছাড়া, আসিবার সময় ঠাকুমা সিঁথিতে খানিকটা সিঁদুর লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারও অনেকখানি ঘামের সঙ্গে মিশিয়া তাহার শুভ্র কপালকে আপনা আপনি রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। আগের দিনের রাত্রি জাগরণ ও দুশ্চিন্তার ফলে চোখের কোলে গভীর কালিমা—এক কথায়, তাহার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তবুও, কপালের উপর হইতে ভিজা চুলগুলি একটা আঙুলে করিয়া সরাইতে সরাইতে ইন্দিরা ভাবিল, তাহাকে খুব খারাপ দেখাইতেছে না ত! বাপের বাড়ীতে চিরকাল সে শুনিয়া আসিয়াছে যে তাহার স্ত্রী-জনোচিত কমনীয়তার নাকি একান্ত অভাব, তাই তাহার রূপ থাকা সত্ত্বেও, তাহাকে পছন্দ করা কঠিন। 'গেছোমেয়ে' 'মদ্দাটে' 'ঘোড়ায়চড়া মেয়েমানুষ' এই সব তাহার চিরকালের আখ্যা। সুতরাং আশঙ্কা ছিল যে বধূবেশে হয়ত তাহাকে খুবই বেমানান দেখাইবে, কিন্তু হঠাৎ আজ সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবিষ্কার করিল যে তাহাকে বধূ সাজিয়া অন্যান্য নব-অনুরাগিণী বধূদের মতই দেখাইতেছে। কখন আর কী করিয়া ইহা যে সম্ভব হইল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না, শুধু আবেশ-মুগ্ধ-নেত্রে নিজের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনে পড়িল স্বামী ললিতের কথা।—লোকটি শুভদৃষ্টির সময় কিছুতেই ভাল করিয়া মুখ তুলিতেছিল না, অথচ একবার চোখাচোখি হইবার পর হইতে কতবার কত ছলেই না তাহার দিকে চাহিতেছিল। বাসরঘরে আত্মীয়াদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া কেবলই যে তাহার গোলমাল হইতেছিল, তাহার কারণটাও ইন্দিরা জানে, ললিতের মনটা ছিল নতমুখী নববধূর দিকেই। ইন্দিরা ইচ্ছা করিয়াই ললিতের দিকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেছিল আর তাহার জন্য বেচারার চোখে কী করুণ মিনতি।...ইন্দিরা আপন মনেই হাসিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সুখে ও লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখে কে যেন খানিকটা আবীর ছড়াইয়া দিল।

অকস্মাৎ আয়নায় আর একখানা মুখ তাহারই মুখের পাশে প্রতিফলিত হইল। এ তাহার দেবর, ললিতের ঠিক পরেই যে ভাই, অসিত, একেবারে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া। আয়নাতে ইন্দিরার সহিত চোখাচোখি হইতেই লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। ইন্দিরাও ত্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিল। ছিঃ ছিঃ, না-জানি অসিত কি ভাবিল।

একটু পরেই তাহার কানে গেল অসিত চাপা গলায় বলিতেছে, আচ্ছা কী তোমাদের আক্কেল মা! এতক্ষণ এসেছে একটা মানুষ, এখনও সেই বেনারসী জড়িয়ে বসে রয়েছে—কাপড়টাও ছাড়াতে পারোনি! মুখহাত ধোওয়াবে, জল খাওয়াবে—এসব কথাও কি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে?

তাহার শাশুড়ী জবাব দিলেন, মনে করিয়ে দিতে হবে কেন বাছা, সব মনে আছে। কী করব, একলা মানুষ, যে দিকটিতে না যাবো সে দিকেই গোলযোগ বেধে বসে থাকবে! ওলো ও সরি, বিন্দী, তোদের কি একটু বিবেচনা নেই? এই খেটে মুখ দিয়ে রক্ত তুলছি, এর মধ্যে কি আবার আমাকেই গিয়ে বৌয়ের কাপড় ছাড়াবার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে? তোরা কি একটা কাজও পারিস না? আর বড় বৌমাও ত রয়েছে, কা'কে বলব বলো, সব হয়েছে সমান!

তিনি আরও কিছুক্ষণ বকিয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে সরি বিন্দী অর্থাৎ তাঁহার দুই যমজ কন্যা হৈ হৈ করিয়া উঠিল, এরি মধ্যে অমনি নতুন বোয়ের কথা টুকুস্ ক'রে কে লাগালে মায়ের কাছে, ছোড়দা বুঝি? বাব্‌বা, বাড়ী না ঢুকতে ঢুকতেই এই। বড় বৌদি এসেছিল তবু একটু ময়লা, তাই এখনও বাপের বাড়ীতে ঠাঁই হচ্ছে, এবার সুন্দরী বৌ এসেছে, দেখছি এখানকার মায়া কাটাতে হবে!

অসিত কী বলিল বোঝা গেল না। কিন্তু সরমা, বিনো দিনী ও বড়বৌ এবং তাহাদের সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে আবার আসিয়া পড়িল।

সরমা কহিল, চলগো বৌদি ও ঘরে, ঐখানেই কাপড়-টাপড় ছাড়বে। কলঘরও ঐ পাশে, মুখহাত ধোও ত চলো।

বড়বৌ এখনও বধূ, সে ঘোমটার মধ্য হইতেই ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, বিন্দী ঠাকুরঝি, ওর তোরঙ্গটা দেখেছ, কী কাপড় চোপড় আছে?

বিন্দী ঘাড় নাড়িয়া চুপি চুপি জবাব দিল, দেখেছি ভাই। ঐ অম্‌নি থানকতক ক'রে সব রকম দিয়েছে। তোমার সঙ্গে যা কাপড় এসেছিল তার অর্দ্ধেকও নেই।

বড়বৌ তেমনি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, তা হোক্ ভাই, তাতে ত দোষ হবে না, এবারে যে সুন্দর বৌ এসেছে—

ইন্দিরার ঘাড় আরও নিচু হইয়া গেল। সরমা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া তাড়া লাগাইয়া কহিল, বিন্দী, কী দাঁড়িয়ে আছিস সঙের মত, যা না, তোরঙ্গ খুলে একটা দিশী কাপড় বার ক'রে নিয়ে আয় না—

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিন্দী বলিল, যাচ্ছি, যাচ্ছি—বলি সাবান-টাবান চাই ত।

সরমা জবাব দিল, ওসব কিছু দরকার নেই, কলঘরে এইমাত্র আমার নতুন সাবান রেখে এসেছি। চলগো বৌদি—

সামান্য কিছু প্রসাধনের পর ইন্দিরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। ইহার পর একথালা খাবার আসিয়া পৌঁছিল। জল খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি। যাহারা অনুরোধ করিতেছে তাহারা সকলেই বিবাহিতা—সবাই জানে যে এ অবস্থায় খাওয়া যায় না—তবু পীড়াপীড়ির অন্ত নাই।

যে ঘরটাতে ইন্দিরা বসিয়াছিল সেটা নাকি ললিতেরই ঘর অর্থাৎ এখন হইতে তাহারও। ইহার এক ফাঁকে ললিত একবার ব্যস্তভাবে ঢুকিল, অকারণে দেরাজটার দু-তিনটা টানা খুলিয়া কী নাড়াচাড়া করিল, আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। বড়বৌ আর বিন্দী তখন চুপি চুপি আপোষে আলাপ করিতেছিল; কিন্তু সরমা মুখ টিপিয়া হাসিল, আর ইন্দিরা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, লোকটার কী আক্কেল! বুদ্ধি বিবেচনা যদি একটু আছে! দেরাজ হইতে কিছু একটা বাহির করিয়া লইয়া গেলেও ত চলিত।

ইতিমধ্যে নিচে আরও বহুলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আত্মীয়া-

কুটুম্বিনীর দল একে একে আসিতেছেন। বিন্দী কহিল, মুঙ্গেরের পিসিমা এলেন বোধ হয়—ওলো সরি, শোন্, আমাদের মোহিনীদির গলা না? চল্—দেখে আসি—

ফলে সকলেই নিচে নামিয়া গেল। ইন্দিরা আবারও একা, সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিছানাতে গা এলাইয়া দিল। সমস্ত শরীর তখন ক্লান্তিতে ভাঙিয়া আসিতেছে, আর যেন বসিয়া থাকা যায় না! কিন্তু একটু পরেই লক্ষ্য করিল দ্বারপ্রান্তে অস্পষ্ট একটা ছায়া, কে যেন আড়াল হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। একটু ঘাড় ফিরাইতেই দেখিল বছর চৌদ্দ-পনেরোর একটি ছেলে, ললিতের সহিত মুখের এতই সাদৃশ্য যে চিনিতে ভুল হয় না—এ-ও তাহার একটি দেবর।

সহসা চোখোচোখি হইতেই দারুণ লজ্জা পাইয়া জিতু পলাইতেছিল কিন্তু ইন্দিরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চুপি চুপি ডাকিল, এসো না ভাই ঠাকুরপো—

জিতু অপ্রতিভ-ভাবে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। ইন্দিরা তাহার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া বলিল, অমন চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে যে, আমি বুঝি তোমার পর?

ইন্দিরার ঠিক পরের যে ভাইটি, তাহার এমনিই বয়স, তাহার কথাই ইন্দিরার মনে পড়িয়া গেল।

জিতু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, না, তা নয়। ভাবলুম আপনার শরীর খারাপ, শুয়েছেন, মিছিমিছি ঘরে ঢুকলেই আবার হয়ত আপনি উঠে পড়বেন—

ইন্দিরা কহিল, তা হোক্।—তুমি ব'সো। কিন্তু তা ব'লে তুমি ভাই আমাকে 'আপনি' বলতে পারবে না, বড্ড যেন পর পর লাগে।

জিতু বলিল, তবে কী বলব ?

কেন, 'তুমি' বলবে। তোমার দাদাকে কী বলো ?

জিতু ঘাড় নিচু করিয়া কহিল, বা-রে ! একদিনেই কি বলা যায় !

এই সময়ে নিচে হইতে অসিতের গলা পাওয়া গেল, জিতু ! ওরে জিতু !

জিতু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ছোড়দা ডাক্‌ছে বৌদি, আমি এখন আসি। বোধ হয় আবার কোথাও নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে।

ইন্দিরা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তুমিই বুঝি সব নেমন্তন্ন করছ ?

জিতু লজ্জা পাইয়া কহিল, না, তা নয়। ভট্‌চাজ্জি মশাই যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে থাক্‌তে হচ্ছে—

জিতু চলিয়া গেল। কিন্তু ইন্দিরার আর শোওয়া হইল না। কারণ সেই সময়েই ওপাশের বারান্দায় আবার কাহার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দিরা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া ভাল করিয়া বসিতে না বসিতেই ঘরে ঢুকিল, উনিশ কুড়ি বৎসরের একটি বিবাহিতা মেয়ে। মেয়েটির দিকে একবারমাত্র চাহিলেই নজরে পড়ে তাহার অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ এবং বড় বড় চোখ। কিন্তু আর যেন কোথাও কোন শ্রী নাই, অত্যন্ত কঠিন ও পরুষ মুখের ভাব।

সে কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, তুমিই বুঝি নতুন বৌ এলে ?

ইন্দিরা একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মিনিট কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,

ভাল। ললিতদা তোমাকে নিজে দেখেই এনেছে বোধ হয়? পছন্দ হ'লেই ভাল।

আরও কিছুক্ষণ সে তেম্‌নি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইন্দিরা তাহার এই কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল; সে নীরবে বসিয়া ঘামিতে লাগিল, কী আলাপ করিবে ভাবিয়া পাইল না।

আরও একটু পরে সেই মেয়েটিই কহিল, শোন, মুখ তুলে চাও।... আমি তোমার চেয়ে ফরসা না কালো?

ইন্দিরা অস্পষ্টস্বরে কহিল, ফরসা।

তোমার চেয়ে ভালো দেখতে না খারাপ? না, না, চুপ ক'রে থেকো না, জবাব দাও!

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দিরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই মেয়েটির মধ্যে কোন শ্রী খুঁজিয়া পাইল না। তবু মুখে কহিল, অনেক ভালো।

হুঁ। তবু তোমাকে পছন্দ ক'রেই এনেছে।

সে আর দাঁড়াইল না। চোখের দৃষ্টিতে যেন এক ঝলক্ অগ্নিবৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাহির হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে ঢুকিলেন মুঙ্গেরের পিসিমার দল। পিসিমা, তাঁহার মেয়ে মোহিনী, তাঁহার পুত্রবধূ—একদল। সঙ্গে সঙ্গে সরি-বিন্দীও।

ঘর ভরিয়া গেল। আবার সেই মুখ তুলিয়া দেখানো—লজ্জায় চোখ বুজিয়া আসা। পিসিমা পুত্রবধূর দিকে কী যেন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, বাঃ, বেশ বউ হয়েছে আমাদের ললিতের, খাসা বৌ। ওর বরাতটাই ভালো।

বলিয়া একজোড়া সোনার ঝুম্‌কো বাক্সসুদ্ধ হাতে গুঁজিয়া দিলেন। মোহিনী এতক্ষণ পিছন হইতে একদৃষ্টে দেখিতেছিল, এখন কোলের ছেলেটা নামাইয়া দিয়া কাছে আসিয়া সহসা পাশে বসিয়া পড়িল, তাহার পর দুই হাত দিয়া ইন্দিরাকে জড়াইয়া ধরিয়া দুই গালে দুইটা চুম্বন করিয়া কহিল, বেশ ভাই বৌদি, তোমাকে আমার বড্ড পছন্দ হচ্ছে। আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম ত তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতুম, না হয় ললিতদা শেষ পর্য্যন্ত পুলিশে দিত!

সবাই হাসিয়া উঠিল। সরমা কহিল, আহা, আমাদের মোহিনীদি নতুন বৌ পেয়ে যে গলে গেলে একেবারে! এখন আর আমাদের দিকে নজর নেই—আগে ত আমাদের নিয়েই পালাবে বল্‌তে!

মোহিনী একটা ভালো হাতীর দাঁতের সিঁদুরকৌটা বাহির করিয়া খানিকটা সিঁদুর লইয়া ইন্দিরার সিঁথিতে লাগাইয়া দিল, তাহার পর কৌটাটা হাতে দিয়া কহিল, এই কৌটো থেকেই সিঁদুর নেবে রোজ; আমার দেওয়া কৌটো, ওর পয় আলাদা। আমার শাশুড়ী সধবা গেছে, দিদিশাশুড়ীও গেছে—আমিও যাব, দেখবে!

সগর্ব্ব হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তাহার, সে একবার উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিল, সবি হাসছিস, দেখবি যাই কি-না!

ইতিমধ্যে বিন্নী কাছে আসিয়া ইন্দিরাকে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া প্রশ্ন করিল, আমাদের আসবার আগে ঐ যে ছুঁড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ও কিছু বলছিল নাকি তোমাকে?

ইন্দিরা কী জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া

রহিল। বিন্নী তখন নিজেই বলিল, কী আস্পদ্দা ছুঁড়ির, আর কি সাহস! জানো বৌদি, আমাদের মেজদাকে কি কম ফাঁদে ফেলেছিল ও! মেজদা দিনকতক ওকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল একেবারে। ছেলে এই বিষ খায় ত এই বিষ খায়—কী কাণ্ড! তবে নাকি বাবা বড় শক্ত মানুষ, তাই কিছুতে নুইল না। শেষে বেগতিক দেখে ওর বাবা অন্য বিয়ে দিলে।...সাংঘাতিক মেয়ে ও!

সহসা ইন্দিরার মনে হইল মনের মধ্যে অনেকগুলি আশার আলো একসঙ্গে নিভিয়া গেল। উৎসববাড়ীর যে রেশ তাহার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহারও সব কয়টি তার অকস্মাৎ যেন বেসুর বাজিয়া উঠিল। সে বিবর্ণ মুখে একবার ঢোঁক গিলিল।

সরমা কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, কার কথা বলছিস্ লা বিন্নী?

বিন্নী কহিল, আমাদের হিমি, আর কার কথা, কেন দেখিস্‌নি, আমরা যখন আসছি, হিমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গালে হাত দিয়া সরমা কহিল, ওমা, তাই নাকি? কী সাহস বাবা, কালামুখ এখানে বার করতে লজ্জা করে না ওর!

বিন্নী কহিল, হ্যাঁ, ওর আবার লজ্জা। লজ্জা হবে একেবারে ম'লে। মায়েরও যেমন, ওদের বাড়ী আবার গেল নেমন্তন্ন করতে।

সরমা কহিল, তা ও যে আবার এ ভিটের পা দেবে, তা মা কেমন ক'রে জানবে বল্।

এখনও কি মেজদার আশা ছাড়তে পারেনি ও?...

সহসা ইন্দিরার বিবর্ণ মুখের দিকে চোখ্ পড়িতে মোহিনী কহিল, বৌদির মুখটা অমন শুকিয়ে গেল কেন ভাই! কোন অসুখ করছে কি?

ইন্দিরা নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু মোহিনী শুনিল না, বলিল, তুমি 'না' বললে কি হবে ভাই ও আমি জানি যে, আমারও ত বিয়ে হয়েছে, আর সে এমন বেশী দিনের কথা নয় যে ভুলে যাব।...একে উপোষ, তার ঘুম নেই, তার এই ধকল, শরীরের যা অবস্থা হয় তা আমি জানি ত!...ওরে তোরা চ' দেখি—আমরা নিচে যাই ভাই বৌদি, মামিমার সঙ্গে এখনও দেখাই হয়নি বলতে গেলে—তুমিও বরং একটু শুয়ে পড়ো। এই সরি চল্, বিন্দী ওঠ্—এখন আর বেচারীকে জ্বালাতন করিস্‌নি।

মোহিনী একরকম জোর করিয়াই সবাইকে টানিয়া লইয়া গেল। খালি গেল না ছোটর দল। তিন চারিটি ছেলেমেয়ে তখনও তাহাকে ঘিরিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল। সুতরাং ইন্দিরা শুইতে পারিল না, চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। যদিও তখন সত্যই তাহার মাথাটা রীতিমত ধরিয়া উঠিয়াছে—

বারান্দার দ্বারপথে কাহার যেন একটা ছায়া পড়িল। একটু পরেই অসিতের গলা পাওয়া গেল, এই বেবি, শোন্—

একটি বছর-আষ্টেকের মেয়ে সেই দলের মধ্য হইতেই সাড়া দিল, ছোটকা' ডাকছ?

সে উঠিয়া গেল, এবং একটু পরেই একখানা পাখা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে সাড়ম্বরে হাওয়া করিতে বসিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ইন্দিরা হাসিয়া তাহার হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইতে গেল, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িল না, বরং গম্ভীর মুখে কহিল, ছোটকা'

ভারি বকাবকি করছে আমাকে, বলে তোরা অতগুলো লোক হাঁ ক'রে বসে রয়েছিস্ ওখানে, এ কথাটাও কি আবার ব'লে দিতে হবে, একটু বুদ্ধি নেই! সে হবে না কাকীমা, বাতাস আপনাকে আমি করবই—

অগত্যা ইন্দিরা চুপ করিয়া রহিল। হাওয়াটাতে বাস্তবিক বড় আরাম বোধ হইতেছিল তাহার। সঙ্গে সঙ্গে অসিতের প্রতি কৃতজ্ঞতা-তেও তাহার মন ভরিয়া গেল; এখানে আসা পর্য্যন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই লোকটির যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়াছে যে বাড়ীর মধ্যে এই লোকটিরই বুদ্ধি বিবেচনা সকলের চেয়ে বেশী।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। যত আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা লইয়া সে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার বিকশিত কুমারীজীবনের যত কিছু স্বপ্ন—সমস্তরই আনন্দমঞ্জরীগুলি কিছুক্ষণ পূর্ব্বের সেই গৌরাঙ্গী মেয়েটির উষ্ণ নিঃশ্বাসে যেন পুড়িয়া ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে, আর তাহারই অসহ-বেদনা কণ্ঠরোধ করিয়া ধরি-তেছে। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে, খাওয়া-ভাজা শুরু হইয়াছে এই সংবাদ পৌঁছিতে ছেলের দল সরিয়া পড়িয়াছে—ইন্দিরা তখন একা। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, তাহারই চমৎকার স্নিগ্ধ ঝির-ঝিরে হাওয়ায় তাহার মাথা যেন অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। সে একটা লোহার থামে মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিল। উৎসব বাড়ীর কোলাহল সেখানেও কানে আসিতেছিল; বাগান হইতে ভাসিয়া আসা মিশ্র ফুলের গন্ধ মিঠায়ের

গন্ধের সহিত মিলিয়া বার বার তাহাকে স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, এই আনন্দ-উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই, ইহার নায়িকা সে-ই—কিন্তু কিছুতেই তাহার মনে কোন উৎসাহ জাগিল না। সামান্য একটুখানি ইতিহাস এই সবকিছুই তাহার কাছে অর্থহীন করিয়া দিয়াছে, মনে হইতেছে ইহার কোনও অর্থই কোনদিন সে খুঁজিয়া পাইবে না।...

বহুক্ষণ সে এইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে-যে কোন একটা বিশেষ কথা ভাবিতেছিল তাহা নয়, কোন বিশেষ আঘাতের কথাও নয়, তবু কখন যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে শুরু হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এমন কি, কখন যে ললিত নিঃশব্দে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে টের পায় নাই। সহসা তাহার চমক ভাঙিল ললিতের স্পর্শে। সে আস্তে আস্তে ইন্দিরার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, তুমি এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে কেন ইন্দু, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে—ও কি, কাঁদছ তুমি?...

ইন্দিরা চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিল। কিন্তু চোখের জল তাহার, বোধকরি ললিতের স্পর্শেই, আরো বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে কিছুতেই কান্না চাপিতে পারিল না।

ললিত অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর সহিত পরিচয় বেশীক্ষণের নহে, এমন কি পরিচয় নাই বলিলেও চলে, এক্ষেত্রে কী বলা কিংবা কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অসহায়-ভাবে খানিকটা এদিক-ওদিক চাহিয়া ইন্দিরার একখানা হাত নিজের

হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল, কেঁদো না লক্ষ্মীটি! আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, ছি!...তোমার কি মায়ের জন্যে মন কেমন করছে? এইত পাঁচ-ছটা দিন পরে আবার সেখানে যাবে। ভয় কি!...এখানে কি কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?

ইন্দিরা নীরবে ঘাড় নাড়িল। তাহার পর বার বার মুছিয়া চোখের জলটাকে কতকটা সংযত করিয়া লইল, এবং ললিতের হাত হইতে হাতটা টানিয়া লইয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। ললিতও পিছু পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকিল কিন্তু আর কাছে গেল না। সেখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা ইতস্তত করিয়া আপনমনেই কহিল, এরাই বা গেল কোথায় ছাই, কী সব আক্কেল জানি না! বেচারীকে একলা রেখে...আচ্ছা দেখছি আমি, সরিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

ইন্দিরা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, না, আমি বেশ আছি। কাউকে ডাকবেন না—

আবারও দুজনে নীরব।

খানিকটা পরে ললিত আস্তে আস্তে গিয়া চৌকীটারই একপাশে বসিয়া পড়িল। তাহার বুকে এ কিসের চঞ্চলতা, সে কিছুতেই ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছে না কেন?...ইন্দিরারও মনে হইতেছিল যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহার বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে—

ললিত চুপি চুপি কহিল, তোমাকে পেয়ে একটু আগে আমার নিজেকে কী সৌভাগ্যবানই যে মনে হচ্ছিল! কিন্তু তখন তোমার দিকটা ভাবিনি, তোমাকে পেলুম এই আনন্দেই মাতাল হয়ে ছিলুম। তুমি যে তেম্নি আমাকে পাওয়া দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করতে পারো

একথাটা তখন মনে পড়েনি। সত্যিই ত, কাই বা আমার যোগ্যতা।

কে জানে কেন, ললিতের গলার সুরে ইন্দিরার কণ্ঠ উপ্‌চাইয়া কান্না বাহির হইতে লাগিল। সে কোনমতেই অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

ললিত আবারও কী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নিচে হইতে তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। তিনি কাহাকে যেন চুপি চুপি বলিতেছেন, তুইও যেমন, বৌ একলা আছে ব'লে দুর্ভাবনায় ত তোর ঘুম হচ্ছিল না!...ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, তা ভুলে যাস্ কেন?...ভাবলুম যে এসে অবধি ত আমি একটি মিনিট অবসর পাইনি, যেতেও পারিনি, এখন একটু গিয়ে নতুন বৌয়ের কাছে বসি; ওমা, গিয়ে দেখি ছেলে-বৌ আমার দিব্যি বারান্দায় হাত ধরাধরি ক'রে গল্প করছে, যেন কতকালের পরিচয়। আমি লজ্জা পেয়ে পালিয়ে এলুম।

ইন্দিরা জিভ কাটিয়া ঘাড়টা আরও নিচু করিল। ললিতও আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না, বিষম লজ্জিত হইয়া ওপাশের বারান্দা দিয়াই পলায়ন করিল।

নিচে হইতে সরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওমা তাই নাকি! অবাক করেছে বাবা! আমরাও ত আজকালকার মেয়ে, কিন্তু এমন বেহায়া—

কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, মোহিনীদিই বোধ হয়—বলিল, তুই থাম্ সরি। সবাইকেই চিনি, আর ষাঁড়ের মত গলা বার ক'রে অত জাহির করতে হবে না! তুই ত বাসরঘর থেকেই বরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করতে শুরু করেছিলি—

একটু পরেই মোহিনী উপরে আসিল। কোলের ছেলেটাকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বিছানার উপরেই বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, ওমা, তুমি ত একলাই রয়েছ, তবে যে ওরা—

তাহার পরই কথাটা চাপিয়া গিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার চোখ অত লাল কেন ভাই, যেন মনে হচ্ছে কাঁদছিলে—

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িল। কিন্তু মোহিনী ছাড়িবার মেয়ে নয়, সে ডানহাতে তাহার চিবুকটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, উঁহু, তুমি না বললেই আমি শুন্‌ব কেন? এযে দিব্যি কান্নার চিহ্ন দেখ্‌ছি। ব্যাপার কি বলো ত, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে?

ইন্দিরা কথাটা চাপা দিবার জন্য সায় দিল। কিন্তু এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি-শালিনী মেয়েটিকে তবু ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না ভাই, আমায় অত সহজে ঠকাতে পারবে না। আমি তখনই দেখে গেছি, হঠাৎ তোমার কী হ'ল। ওহো.. সরি-বিন্দির কথাটা তোমার কানে গেছে, না? আ আমার কপাল!...নিশ্চয়ই তাই।

ইন্দিরা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

মোহিনী কাছে আসিয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কহিল, ওরে পাগলী,...বৌদিই হও আর যা-ই হও, বয়েসে আমার ছোট...পাগ্‌লীই বলব, ওসব কথা নিয়ে কি দুঃখু পেতে আছে! তখন সবে ওর উঠ্‌তি বয়স আর মেয়েটাও ভারি পাজী, ওকে জড়াতে চেয়েছিল। তখন ঝোঁকের মাথায় কী ব'লেছিল সেই কথা কি আজও

ধরে বসে থাকে কেউ? তা ছাড়া পুরুষমানুষ, বিয়ের আগে অমন অনেক নেশা লাগে, তখন ত আর তুমি আসোনি ভাই, এমন ভাগ্যি যে হবে তা ও জানতও না।...নাও নাও, ওসব তুচ্ছ কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। একটু মাথা তুলে চাও দেখি আমার দিকে, মুখ তোল...হুঁ, এমন রূপ যার, সে আবার ঐসব ভেবে মন খারাপ করে!...ওলো বৌদি, আমারই যে মাথা ঘুরে যাচ্ছে তোমার দিকে চেয়ে, মেজদা ত তুচ্ছ। চিরকাল মাথা মুড়িয়ে এই পায়ে দাসখৎ লিখে বসে থাকবে দেখ্‌বি—

ইন্দিরা তাহার ভাবভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিল। তখনও তাহার চোখের পাতা ভিজা, তাহারই মধ্যে এই হাসিটি শরতের আকাশের মতই ভারি মধুর লাগিল। মোহিনী তাহাকে একটা চুম্বন করিয়া কহিল, চল্ ভাই বৌদি, আমরা নিচে যাই, ওদের কাছে গিয়েই বসিগে—

ইন্দিরা উঠিয়া মোহিনীর ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তখন তাহার মন হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের বেদনার যেন চিহ্নমাত্রও নাই। আবার উৎসববাড়ীর নেশা লাগিয়াছে তাহার মনে।

মোহিনীর পিছনে পিছনে লজ্জিত নত-মুখে সে নিচে নামিয়া গেল।

ফুলশয্যার ইতিহাস

একে-একে সকলে বাহির হইয়া গেলে রমেন দোরে খিল দিয়া আলোটা কমাইয়া বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি তখন মাথার বালিশের নিচে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু সে যে ঘুম নয়, তা তাহার দ্রুত নিশ্বাসের শব্দেই বোঝা যায়।

শুভ্র শয্যার সর্ব্বত্র গোলাপের পাপড়ী ছড়ানো, তাহার মধ্যে ফুটন্ত গোলাপের মতই দীপ্তির দেহখানি পড়িয়া আছে। 'পড়িয়া আছে' বলিলে ঠিক বোঝানো যায় না, অত্যন্ত নরম সিল্কের কাপড়ের মত তাহা এলাইয়া আছে।

দীপ্তির দেহখানি ক্ষীণ, সুগোল, সুডৌল এবং সুকুমার। সেদিকে চাহিবামাত্র মনে হয় এ দেহ এতই নরম যে বোধহয় কাহারও হাতের ভরও সহিবে না।...এত সুকুমার দেহ ইতিপূর্ব্বে কাহারও দেখিয়াছে বলিয়া রমেনের মনে পড়িল না। ট্রেণে আসিবার পথে আগের দিন দুই-একবার চুরি করিয়া রমেন তাহার মুখটা দেখিয়া লইয়াছিল, উপবাসক্লিষ্ট মলিন মুখের মধ্যে আয়ত দুটি চক্ষুর লজ্জা-বিজড়িত চাহনির কথা মনে করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন মোচড়াইয়া

উঠিল; আজ সারাদিন সে কাজের ভিতর একবারও ভাল করিয়া দীপ্তিকে দেখিতে পায় নাই সত্য কথা, কিন্তু গতকল্যকার কটাক্ষের স্মৃতিতেই সে মশগুল হইয়া আছে—সমস্ত কাজের মধ্যে সেই দুটি চোখের কথা বার বার তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে।

রমেন পকেট হইতে টর্চচটা বাহির করিয়া একবার দীপ্তির মুখখানি তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। দীপ্তি মুখ তুলিল বটে কিন্তু সে মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য, তাও চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল না।

রমেন একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিছানার তলার দিকে আসিয়া বসিল। তাহার বয়স একটু বেশী হইয়াছে—এ কথা আজ আর কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না; সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে যে বয়সে বিবাহ হয়, সে বয়সকেও সে বহুদিন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ, এই প্রায় যৌবনের প্রান্তসীমায় পৌছিয়া, ঐ পনেরো বছরের মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া কি সে ভুল করিল না? দীপ্তির বয়স যে পনেরোর বেশী নয় তাহার প্রমাণ সে আগেই পাইয়াছিল, আজ আরও নিঃসংশয় হইল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, একেবারে ছেলেমানুষের মুখ!

রমেনের মনে পড়িল বন্ধুবান্ধবরা এই অসমান বিবাহে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু এই মেয়েটিকে সে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিল বলিয়া কাহারও কথা শোনে নাই। আজ তাহার মনে মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল, সে কি পারিবে দীপ্তির মনের মতন হইতে? কিশোরীর প্রণয়লীলার মধ্যে তাহাকে কি নিতান্ত বেমানান দেখাইবে না?

সে একবার চকিতের মধ্যে তাহার এই চৌত্রিশ বৎসরের জীবনযাত্রার দিকে চাহিয়া লইল। অতি শৈশবে তাহার মাথায় এক বিপুল সংসারের ভার পড়িয়াছিল; অর্থ উপার্জ্জন এবং ভাই-বোনদের মানুষ করার চিন্তার মধ্যে সে আর কোনও দিকে নজর দিতে পারে নাই; মা এবং বোন ছাড়া অন্য কোনও রমণীর সঙ্গ বা সাহচর্য্য তাহার অদৃষ্টে মিলে নাই। কোনও অভিজ্ঞতা, কোনও জ্ঞানই নাই তাহার এ বিষয়ে!...যদি দীপ্তি তাহাকে ভালবাসিতে না পারে? যদি সে তাহাকে ভয় করে? তাহার সঙ্গ যদি পীড়াদায়ক বলিয়া মনে করে?

রমেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে জোর করিয়া মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টায় দীপ্তির তনুলতার দিকে চাহিল। সুশ্রী, সুগঠিত তাহার চরণ দুটির কাছেই সে বসিয়াছিল—একবার তাহার পায়ে হাত বুলাইবার লোভ সে সামলাইতে পারিল না। মাখনের মত নরম একখানি পা সে দুই মুঠার মধ্যে ধরিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিল। মুহূর্ত্ত খানেক স্থির হইয়া থাকিয়াই দীপ্তি পা সরাইয়া লইল। বোধ হইল যেন চাপা হাসিতে তাহার পিঠটা বার দুই বেশী করিয়া দুলিয়াও উঠিল, কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ দিল না।...

রমেন জামাটা খুলিয়া নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিল, তারপর দীপ্তির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি ডাকিল দীপু, দীপ্তি!

দীপ্তি তেমনিই চুপ করিয়া রহিল।

হাওড়া জেলার এক দুর্গম পল্লীর অতি গরীবের ঘরে তাহার জন্ম। তাহার জন্মের পরেই তাহার মা মারা যান এবং তাহার বাবার চাকরী

যায়। সে চাক্‌রী তিনি আর পান নাই। কোনও রকমে ছোট ভায়েদের মন জোগাইয়া এবং ভাত্রবৌদের সংসারে খাটিয়া তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন বটে কিন্তু সে থাকা যে মরার অধিক, এ কথা সে এই বয়সেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং সে ছেলেবেলা হইতেই সর্ব্বত্র শুনিয়াছে যে তাহার মতন দুর্ভাগা আর নাই, নিজেও সে কথা বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার চেয়ে যে সব মেয়েদের ভাল অবস্থা, যাহাদের সমস্ত শৈশব ও কৈশোর অবিরত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া কাটে নাই, তাহারাও উপযুক্ত অর্থের অভাবে কেহ মস্তপের হাতে, কেহ বৃদ্ধের হাতে, কেহ অত্যাচারী লম্পটের হাতে পড়িয়াছে; তাহাদের দুর্দ্দশা সে নিজের চোখেই দেখিয়াছে এবং শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিয়াছে নিজের অদৃষ্টের কথা। কখনও ভাবিয়াছে যে তাড়াতাড়ি যাহা-হোক একটা হইয়া যাওয়া ভাল, বিবাহিত জীবনে তবু একটা স্বাধীনতা আছে; আবার ভাবিয়াছে যে বাপের বাড়ীতে লাঞ্ছনার মধ্যে দুঃখ আছে বটে—অপমান নাই, কিন্তু স্বামীর কাছে গিয়াও অদৃষ্টে যদি নির্য্যাতনই জোটে ত তাহার অপমান সে সহিবে কেমন করিয়া? তা-ছাড়া বাপের বাড়ীর দুঃখ একদিন শেষ হইবেই, এই আশায় সে প্রাণ ধরিয়া আছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক যে আজীবন!

এমন সময় একদিন কার্ত্তিকের মত রূপ এবং অগাধ ঐশ্বর্য্য লইয়া রমেন নিজে আসিল তাহাকে দেখিতে। সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। আগেই তাহার রূপ ও ঐশ্বর্য্যের কথা সে শুনিয়াছিল; মনে আছে যে, যে লোকটি মধ্যস্থ হইয়া এ সম্বন্ধ করে, জ্যাঠাইমা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন, কেন ও চেষ্টা করছ মিছিমিছি? ও বাঁদরীর কী আছে যে পছন্দ করবে? শুধু শুধু এ ধাষ্টামো কেন?

তাহার উপর সেদিন তাহাকে সাজাইয়া দিবারও কেহ ছিল না, এমন কি কেহ তাহাকে একটা ভাল কাপড়ও পরাইয়া দেয় নাই। কী দুর্নিবার লজ্জার সহিত লড়াই করিতে করিতে যে সেই পুরাতন দেশী কাপড়টিতে দেহ ঢাকিয়া রমেনের সামনে তাহাকে যাইতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন। তাহার পর সে কেমন করিয়া দূরে জামরুল গাছের আড়াল হইতে রমেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং কী গভীর বেদনায় সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়াছিল তাহা সে আজও ভোলে নাই। সে চোখের জলে তুলসীমঞ্চের মাটি ভিজাইয়া বার বার জানাইয়াছিল, হে ঠাকুর, যেন আমায় পছন্দ করে!

কিন্তু তবুও, ভগবান যে সত্যই তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন তাহা সে কোনও দিনই আশা করে নাই। তাই যেদিন খবর আসিল যে রমেন তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তখন বাড়ীর অন্যান্য লোকের মত সে-ও সে কথা বিশ্বাস করে নাই। জ্যাঠাইমা এই সেদিন পর্য্যন্ত যখন বলিয়াছেন, 'ও তোকে ঠাট্টা করছে' তখন সে না মুখে, না মনে, কোন প্রতিবাদই করিতে পারে নাই, শুধু গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত, অন্যের অজ্ঞাতসারে মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁদিয়াছে।

তাহার পরে শেষ পর্য্যন্ত সেই দিনটিও আসিয়া পড়িল, যেদিন আর কাহারও কোন সংশয় রহিল না। কাকী ও জ্যাঠাইয়ের দলের হইল ঈর্ষা, কারণ তাঁহাদেরও বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে; সুতরাং লাঞ্ছনার মাত্রা সেদিক দিয়া বাড়িয়া গেল। কিন্তু তা বাড়ুক, সে লাঞ্ছনা তখন আর তাহাকে বেদনা দিতে পারে নাই; সে মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছে। উপকথার রাজপুত্রের মত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া

তাহারও স্বামী আসিতেছেন, নিমেষে এই সব বেদনা সোনা হইয়া যাইবে। আজ যত দুঃখই আসুক, তাহাকে সে গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু কোথাও কোথাও তাহার আদরও বাড়িল। তাহার কাকার দুই মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এতদিন ভাল করিয়া দীপ্তির সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না, এইবার তাহারা দীপ্তিকে ঘিরিয়া ধরিল। নিজেদের বিবাহিত জীবনের নানা গল্প তাহার কাছে করিয়া, নানা উপদেশ দিয়া তাহাকে তৈরী করিতে লাগিল। মনে আছে বিবাহের ঠিক আগের দিনই অনিলা তাহাকে বলিয়াছিল, দেখিস্ ছুঁড়ি, চট্ ক'রে যেন সোয়ামীর হাতে ধরা দিস্‌নি! তাহ'লে দাম ক'মে যাবে। অন্তত তিন চারদিন খেলিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা কইবি!

তাহার জবাবে অনুপমা বলিয়াছিল, হাঁ, ধরা না দিয়ে পার পাবে কিনা! আজকালকার ছেলেরা, পায়ে ধ'রে কেঁদে যেমন ক'রে হোক কথা কওয়াবেই। বাব্বা, আমাদের মানুষটি যা কাণ্ড করলে—সব প্রতিজ্ঞাই ভেসে গেল।

অনিলাও হাসিয়া বলিয়াছিল, তা—যা বলেছিস, যা বেহায়াগিরি করে—! মকর বলছিল যে ফুলশয্যার রাত্রিতে সে তার বরের সঙ্গে কথা কয়নি ব'লে শেষ পর্য্যন্ত বেচারা মাথা খুড়তে শুরু করেছিল, একেবারে রক্ত-গঙ্গা।

কথাটা শুনিয়া তাহার সারা দেহ আবেশে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সারা রাত ঘুমাইতে পারে নাই! তাহার কথা, শুধু দুটি মুখের কথা শুনিবার জন্য একটা পুরুষমানুষ পায়ে ধরিতে পারে! এও কি সম্ভব? ঐ সুন্দর পুরুষটি, যাহার জন্য সবাই তাহাকে ইতিমধ্যেই ঈর্ষা করিতে

শুরু করিয়াছে, যাহার বংশ এবং ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি আজ এ গ্রামের সকলের মুখে মুখে, সে-ও তাহার পায়ে ধরিবে, তাহার কাছে মিনতি জানাইবে, শুধু তাহার মুখের কথা শুনিবার জন্য ? তাহার সহিত কথা কহিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইবে ?...

সে কিছুতেই এ সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ধারণা করিতে পারিল না, অথচ অবিশ্বাস করিতে গেলেও মনের ভিতরটা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে। এম্‌নি করিয়া আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল, ভোর-রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিল যে, সে অভিমান করিয়া একটা ঘরে বসিয়া আছে এবং তাহার স্বামী রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটিতেছে।

বিবাহের দিনই বা কী লাঞ্ছনা তাহার! গায়ে হলুদের তত্ত্বের বেনারসী কাপড়খানার মূল্য যখন তাহার বিশ্বনিন্দুক ন'কাকীমা পর্য্যন্ত অন্তত একশ' টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন তখন আর কাহারও ঈর্ষা বাধা মানিল না। যত কিছু বাহ্য মুখোষ খুলিয়া ফেলিয়া সকলে একেবারে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু সে সব কোনও দিকে তাহার তখন চিন্তা ছিল না, তাহার মনে সে এক অপরূপ সুর বাজিয়া চলিয়াছে, তাহাতেই সে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ঐ অসংখ্য দামী শাড়ী, ঐ রকমারী জামা, এবং বহুমূল্য সোনার হার আসিয়াছে শুধু তাহারই জন্য, একান্তভাবে ঐগুলি তাহারই!

শুভদৃষ্টির সময় সে তাই সকল লজ্জা ভুলিয়া চোখ মেলিয়া তাহার স্বামী, তাহার দয়িতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। রমেনের সৌম্যসুন্দর মুখের দিকে, তাহার সঙ্কোচ-ভরা কুণ্ঠিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল; তাহার যত কিছু গ্লানি যেন নিমেষে ফুলের মালায়

মত্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। ছোটবেলায় শুনিয়াছিল, গৌরী মহাদেবকে পাইবার জন্ত সহস্র বৎসর অনাহারে তপস্তা করিয়াছিলেন; তাহার মনে হইল যে সেও এই মাত্র পনেরো বছরের কৃচ্ছ্র সাধনেই মহাদেবকে পাইয়াছে। সে মনে মনে বার বার ভগবানকে বলিতে লাগিল, হে ঠাকুর, যেন ভোগে হয়!

তারপর তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে আসা! শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ সকলের যত্নে ও স্নেহে গত চব্বিশ ঘণ্টা সময় যেন তাহার এক মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে! মনে হইল যেন সে সত্য সত্যই উপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে কোন এক রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আজ আর সে সংসারের সকলের অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা, অনাবশুক ভার মাত্র নয়—আজ সে রাজেন্দ্রাণী! বহুলোকের সুখ-সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রী সে!

দীপ্তির সব কথাগুলি মনে পড়িয়া একবার সারা দেহ আনন্দে, আশায়, আবেশে শিহরিয়া উঠিল। কোন্ এক সুখানুভূতি তাহার বুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে ছড়াইয়া ক্রমে দেহের অতীত যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। সে সুখ বেদনার মতই টন্ টন্ করিতে থাকে, সারা বিশ্বের বীণায় বেহাগ সুরে আঘাত করে!

রমেন অনেকক্ষণ পিছনে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া তাহার গায়ে আস্তে আস্তে একবার হাতখানা রাখিল। দেখিল সে কাঁপিতেছে; তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার ডাকিল, দীপু, তোমার শীত করছে? শালখানা গায়ে দিয়ে দেব?

দীপ্তি মুখ টিপিয়া হাসিল, সাড়া দিল না।

সে হাসি রমেন দেখিতে পাইল না। সে বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার পিঠে হাত দিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দেখিল ভীরু পাখীর মত তাহার বুক ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে! তাহার মন মমতায় ভরিয়া উঠিল। ভাবিল, ছেলেমানুষ! ভয় পেয়েছে!

সে শালখানা খুলিয়া দীপ্তির গায়ে ঢাকা দিয়া দিল।

কিন্তু এত ভয়ই বা কেন? সে আজ পর্য্যন্ত যত বন্ধুবান্ধবদের ফুল-শয্যার কথা শুনিয়াছে কোথাও ত এরূপ ভয়ের কথা শোনে নাই। অধিকাংশ স্থলেই বরং শুনিয়াছে বধূরাই স্বামীর ভয় ভাঙায়। এই ত কালই ইন্দু বলিতেছিল যে, তাহার বউ ঘরে খিল দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে নাই, নিজেই আলাপ করিতে শুরু করিয়াছিল। তিন ঘণ্টায় এত কথা বলিয়াছিল যে বর্দ্ধমানের রাজার মহাভারতের মত একখানা সহস্রপৃষ্ঠার বই হয়!

তবে কি দীপ্তি তাহাকে পছন্দ করে নাই? না, তাহার বয়সের কথাটা কাহারও মুখে শুনিয়াছে? তাহার নামে কেহ নিন্দা করে নাই ত? রমেন রীতিমত নার্ভাস্ হইয়া উঠিল, আর একবার হেঁট হইয়া জোর করিয়া দীপ্তির মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, দীপু, একবার চোখ চেয়ে দেখ, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

দীপ্তি চোখ খুলিল না। কিন্তু মুখও ফিরাইল না। তখন রমেন মনে অনেকখানি বল আনিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিল—বিবাহিত জীবনের প্রথম চুম্বন!

দীপ্তি এইবার মুখটা ফিরাইয়া লইয়া পুনরায় বালিশের তলায় মুখ

গুঁজিল। বিবাহের পূর্ব্বেকার যতকিছু আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে; মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে যে আশা সে কল্পনাতেও মনে স্থান দিতে পারে নাই, আজ সে ধরিয়া লইয়াছে যে, সে তাহার শুধু ন্যায্য প্রাপ্য মাত্র। সে অসহিষ্ণুভাবে মনে মনে বলিল, এ আবার কি ঢং! এত ভয় কিসের?

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। পাশের ঘরের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। আর মাত্র ঘণ্টা দুই তিন এ ঘরে থাকা চলিবে। রমেনও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। কিন্তু এই চুপ করিয়া শুইয়া থাকার রহস্য সে কিছুতেই ভেদ করিতে পারিল না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নিজের কোন অভিজ্ঞতাই তাহার নাই, বন্ধুবান্ধবরা যতটুকু বলিয়া দিয়াছে সেই পর্য্যন্তই তাহার দৌড়; কিন্তু এরকম সম্ভাবনা ত কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই!...সে কি সত্যই এই ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া ভুল করিল?

আরও কিছুক্ষণ—

তারপর সে ভয়ে ভয়ে দীপ্তির পায়ে আর একবার হাত দিল, মিনিট দুই নিঃশব্দে তাহার পা টিপিতে লাগিল। দীপ্তি বাধা দিল না, মনে মনে শুধু হাসিতে লাগিল, ভাবিল যে এইবার ঔষধ ধরিয়াছে—

রমেন তাহাকে এইবার জোর করিয়া নিজের দিকে ফিরাইল। দীপ্তির মুখখানিকে নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল, কিন্তু সে চুম্বন মরামানুষকে চুমা খাওয়ার মতই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। আর একটা মানুষ যদি নিতান্ত পাষাণের মতই পড়িয়া থাকে ত কেমন করিয়া তাহার কাছে প্রেম নিবেদন করা যায়।

সে ডাকিল, দীপু!

সাড়া নাই। পুনশ্চ কহিল, দীপু, আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমাকে কি তোমার ভয় করে?

দীপ্তি তাহার জবাবে আবারও পিছন ফিরিয়া শুইল। আসল কথা, তাহার হাসি পাইতেছিল। এই বুদ্ধি লইয়া লোকটা বিবাহ করিয়াছে? সে ধরা কিছুতেই দিবে না তাহা স্থির, কিন্তু এ লোকটা কি কোনও দিন জোর করিয়া তাহাকে কথা কহাইতে পারিবে? মনে ত হয় না!

রমেন একটু থামিয়া কহিল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, সত্যি ক'রে বলো!

তবু ও পক্ষ হইতে সাড়া আসে না। রমেনের দেহে ঘাম দেখা দিল। কি বিপদ! এ কি বোবা নাকি? .

সে রাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করিল, আমি ঘুমুই বাবা, কথা না কইলে ত বয়েই গেল!

কিন্তু সেটা কথার কথা! শুইয়া শুইয়া যেন শয্যাকণ্টকী বোধ হইতে লাগিল। তাহার যোল সতেরটি বন্ধুর আজ পর্য্যন্ত বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কৈ কাহারও অদৃষ্টে যে এ-রকমটি ঘটিয়াছে বলিয়া ত শোনা যায় নাই! তাহারই দুর্ভাগ্যক্রমে কি এই মেয়েটির যত কিছু বিপরীত আচরণ?

ওধারে দীপ্তিরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। পাশের ঘরের ঘড়িটা ক্রমাগত টিক্ টিক্ শব্দে মিনিটের পর মিনিট যেন দুই হাতে করিয়া সরাইয়া দিতেছে। তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় রাত্রিটি

কি এমনি করিয়া নীরবে কাটিয়া যাইবে? রাত্রি প্রভাত হইতে আর দেরিই বা কি?…কিন্তু অনিলা, অনুপমা, তাহাদের স্বামীরা পর্য্যন্ত পায়ে ধরিয়া সাধিয়া কথা কওয়াইয়াছে, আর সে-ই বিনা আয়াসে ধরা দিবে, অথচ তাহার মত স্বামী-সৌভাগ্য আর কাহারও কি হইয়াছে?

রমেন ভাবিতেছিল, বড় মেয়ে হইলেও না হয় রাগারাগি করা চলিত, কিন্তু এ যে একেবারে বালিকা, ইহাকে লইয়া কী করা যায়? সে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল কিন্তু দীপ্তির এই কঠিন নীরবতার কোনও কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। কারণ না জানিলে উপায় হয় কি করিয়া?

অনেকক্ষণ পরে সে শুইয়া শুইয়াই দীপ্তিকে নিজের কাছে জোর করিয়া টানিয়া আনিল, অকস্মাৎ তাহার মুখ, বুক, কণ্ঠ অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া তুলিল। দীপ্তি বাধা দিল না, সরিয়াও গেল না। অভিমানে তাহার চোখ দুইটি জ্বালা করিতেছিল, মনে মনে সে বলিল, আমার দেহটার ওপরেই শুধু যদি তোমায় লোভ হয়, তাই তুমি নাও, আমি চাই না কথা বলতে, চাই না তোমায় ভালবাসতে!

রমেনের সারাদেহ একাগ্র উত্তেজনায় তখন কাঁপিতেছে। সে দীপ্তির প্রতিটি অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল, অকারণে তাহার হাতটা কঠিন মুঠার মধ্যে ধরিয়া নিপীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই নিজের আচরণে লজ্জিত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এ কী করিতেছে সে, কাণ্ডজ্ঞান কি তাহার লোপ পাইল!

তাহার লজ্জাটা ক্রমে ক্রোধের আকার ধারণ করিল,—ঐটুকু মেয়েরেই

বা এত কিসের জেদ? এত অহঙ্কার কেন? দীপ্তি কি ভাবে রমেনকে বিবাহ করিয়া মাথা কিনিয়াছে? সে পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইল থাক্ দীপ্তি তাহার অহঙ্কার লইয়া—রমেন আর সাধিবে না।

দীপ্তিও বুঝিতে পারিল না, কোথা দিয়া কি করিয়া এমনটা হইল। সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। ধারায় ধারায় তাহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়া ফুলশয্যার নূতন বালিশ ভিজিতে লাগিল। এমনি করিয়া দুটি নববিবাহিত নরনারী অন্তরের অগাধ আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বুকে করিয়া নীরবে পাশাপাশি শুইয়া রহিল। এবং তাহাদের সেই বেদনাকে উপহাস করিয়াই যেন ঘড়িটা অন্ধকারের মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করিতে লাগিল।

ভোরের আলো শার্শির গায়ে লাগিতেই রমেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই ম্লান আলোতে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল—দীপ্তি কাঁদিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত রাগ মন হইতে চলিয়া গিয়া সে জায়গায় পূর্ব্বেকার আনন্দ আসিয়া জুড়িয়া বসিল। সে ব্যাকুল ভাবে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, দীপু, কি হয়েছে আমায় বলো, লক্ষ্মীটি! বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে? না, আমারই কোন কাজে ব্যথা পেয়েছ? বল, লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি!

দীপ্তির চোখের জল দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এই কথাগুলি এতক্ষণ কোথায় ছিল? এমন করিয়া আগে বলিলে ত তাহার ফুলশয্যার রাত্রি ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

রমেন তাহাকে খানিকটা তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ কি হচ্ছে, দীপু?

এই ত! দীপ্তির বুক জ্বলিয়া উঠিল। অনিলা অনুপমার দল যাহা বলিয়া দিয়াছে, এতক্ষণ পরে বুঝি তাহা মিলিতে চলিল। সে অধীর আগ্রহে অধিকতর মিনতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রমেন আবারও ভুল বুঝিল। সে রাগ করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীপ্তি কিছুক্ষণ কাঠ হইয়া শুইয়া রহিল। কিছুতেই সে তাহার দুর্ভাগ্যের কারণ বুঝিতে পারিল না। এমনি করিয়াই কি সারা জীবন অমৃতের পাত্র তাহার মুখের কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে? এ কি তাহারই সূচনা?

সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া শুষ্ক মুখে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের পাণ্ডুর আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ঠাকুর, একটিবার সে ফিরে আসুক, এবার নিজেই পায়ে ধ'রে তার কাছে মাপ চাইব।

নীচের ঘরে বসিয়া তখন রমেনও ভাবিতেছে, অত রাগ না করলেও চলত। ছেলেমানুষ, আমারই উচিত ছিল, হাতে পায়ে ধ'রে তার ভয় ভাঙানো।

বিশ্বদেবতা পূর্ব্বাকাশে বসিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

প্রত্যহের স্পর্শ

মালপত্র গুছাইয়া, বিছানা পাতিয়া দিতে দিতেই গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। চাকর রামশরণ এ গাড়ি হইতে নামিয়া যখন নিজের গাড়িতে গিয়া উঠিল, তখন ট্রেনখানা অল্প-অল্প চলিতে শুরু করিয়াছে।

প্রতিমা কহিল, হ্যাঁ গা, ও ঠিক গাড়িতে উঠতে পারল ত?

বিনয় খোলা দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, হ্যাঁ উঠেছে ঠিক।

তাহার পর দরজাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া প্রতিমার পাশে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, বিয়েটা আমাদের তাহ'লে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত! কি বলো?—

প্রতিমা লজ্জিত-স্মিতমুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না।

বাস্তবিক, ব্যাপারটা অনুভব করিতে কিছু সময় লাগারই কথা। যে বাধা এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহাদের, সমস্তগুলা লিপিবদ্ধ করিলে মহাভারতের মত একটা বিরাট পুঁথি হইয়া যায়। পর পর সব ব্যাপারটা যেন বিদ্যুৎলেখার মত একবার প্রতিমার চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বিনয়ের গা ঘেঁষিয়া বসিল।

ব্যস্ত হইয়া বিনয় কহিল, কি হ'লো?

প্রতিমা কহিল, কিছু না। বিয়ের কথাটাই ভাবছিলুম।

বিনয় কহিল, তা বটে।

তাহারও সব কথা মনে পড়িয়া গেল। রীতিমত উপন্যাস লেখা যায় তাহাদের বিবাহের ইতিহাসটা লইয়া। বিনয়ের বাবা ও প্রতিমার বাবা প্রতিবেশী হইলেও খুব বন্ধু কখনই ছিলেন না। মেয়েদের মধ্যে আসা-যাওয়া ছিল, সেটা তাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন নাই—যদিচ সেখানেও একটা যে খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা নয়—কিন্তু পুরুষ দুটির মধ্যে সামান্য একটু দেঁতো হাসি ছাড়া কোন বাক্য বিনিময় হইত দৈবাৎ, হয়ত বৎসরে একদিন। প্রতিমার বাবা রমেশবাবু ছিলেন বিনয়ের বাবা সত্যবাবুর মতে—'হাড় কেপ্পন' এবং রমেশবাবু বলিতেন সত্যবাবুকে 'চামার', 'দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না' ইত্যাদি—। সত্যবাবু বড় চাকরী করিতেন, সেই হেতু ভাল চাকরী যাহারা করে না, তাহাদের একটু কৃপার চোখেই দেখিতেন তিনি! আর রমেশবাবুর ছিল সামান্য আয়—বিরাট সংসার চালাইতে হইত তাঁহাকে অনেক হিসাব করিয়া, সুতরাং মিতব্যয়ী না হইয়া উপায় ছিল না।...উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ত' ছিলই না, বরং সামাজিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ হইলে ঠোকাঠুকিও চলিত বেশ, যদিচ সবটাই হাসিমুখে।

এহেন সত্যবাবুর একমাত্র পুত্র বিনয় যখন এম-এস-সিতে প্রথম হইয়া নিজেই তদ্বির-তদারক করিয়া একটা মোটা সরকারী চাকরী বাগাইয়া বসিল, তখন সত্যবাবুর গর্ব্ব ও আনন্দের অবধি রহিল না, তিনি মনে মনে জমিদারের কোন রূপসী কন্যার সহিত পঞ্চাশ হাজার টাকার যৌতুকের

স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বিনয়ই দিল সব মাটি করিয়া—হঠাৎ সে বলিয়া বসিল যে, রমেশবাবুর কন্যা প্রতিমাকেই সে বিবাহ করিবে। আর ঠিক সেই সময়ে প্রতিমাও তাহার মাকে দিয়া রমেশবাবুকে জানাইল যে, সে সাবিত্রীর মত মনে মনে বিনয়কেই স্বামী ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। রমেশবাবুও বলিলেন, 'না'—সত্যবাবুও তাই। ব্যাপারটা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ঢাকুরিয়া লেকের ধারে হাস্যকর বিয়োগান্ত পরিণতিতেই পৌঁছিত, যদি-না দুটি বড় রকমের ভয় থাকিত। বিনয় তখনই পাঁচশত টাকা মাহিনা পাইতেছে—সে ভয় দেখাইল যে, সে পৃথক হইয়া স্বেচ্ছায় প্রতিমাকে বিবাহ করিবে এবং প্রতিমা ভয় দেখাইল যে, তাহার একুশ বৎসর বয়স হইয়াছে, সুতরাং বাবার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিলে তাহার আটকায় না, সে কথা সে জানে এবং বাবা পুনর্ব্বিবেচনা না করিলে তাহাই করিবে। সুতরাং অনেক বকাবকি, অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা, পরস্পরের প্রতি প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে বহু বাক্যবাণ বর্ষণের পর উভয় পক্ষই নরম হইলেন এবং বিবাহের কথাটা পাকাপাকিও হইয়া গেল।

তবু কি নির্ব্বিঘ্নে কাজটা চুকিয়াছে? শেষ মুহূর্ত্তেও সত্যবাবু গৃহিণীকে দিয়া বলাইলেন যে, এ-বিবাহ যদি হয় ত' একদিন তাঁহাকে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে।

বিনয় সব কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, তা বেশ ত', উনি যদি আমার ইচ্ছায় বাধা না দেন ত' আমি ওঁর ইচ্ছায় বাধা দেব না। মোদ্দা বিষয়-আশয় কোথায় কি ক'রে রেখে গেলেন, ভাল ক'রে লিখে রেখে যেতে ব'লো।

মা কাত্যায়নী শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, বলিস কীরে, মুখে উচ্চারণ করতে পারলি! ঐ রাক্ষুসী তোকে গুণ করেছে—নিশ্চয়ই। নইলে তুই ত' এমন ছিলি না!

বিনয় কহিয়াছিল, বাবাকে তোমার চেয়ে বেশী চিনি মা, তাই বলতে পারলুম।

সত্যই সে বেশী চিনিত। কথাটা গৃহিণীর মুখে শুনিয়া প্রথমটা সত্যবাবু জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন, হয়ত সুযোগসুবিধা থাকিলে, তখনই কি করিয়া বসিতেন বলা যায় না; কিন্তু পরে বিষয়-আশয়ের কথা যতই মনে হইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া এখন তিনি মরিলে ঐ 'হাড় কেপ্পন' রমেশটার কত সুবিধা হইতে পারে এবং না মরিলে ছেলের আয় হইতে টাকা জমাইয়া আরও বিষয়-আশয় বাড়ানো যাইতে পারে—এই সব কথা যতই মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, ততই মরিবার ইচ্ছা তাঁহার লোপ পাইতে লাগিল। ছেলের কথায় যে নিদারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল জীবন সম্বন্ধে, তাহাকে দমন করিয়া নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

কিন্তু তবু, কতটা যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল, তাহাও বিনয়ের অবিদিত ছিল না। সে কথাগুলা ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে বলিয়া ফেলিল, সত্যি, মা-বাপের যা অভিশাপ কুড়োনো হ'ল—ফল কী হবে তাই ভাবছি!

কথাটা খুবই হাল্‌কা সুরে সে বলিল—পরিহাস বলিয়াও মনে করা চলিত। তবু কোথায় যেন প্রতিমার দিবাস্বপ্নে আঘাত লাগিল। সে একটু ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে বলিল, তোমার কি এখন অনুতাপ হচ্ছে?

না, ঠিক অনুতাপ নয়। তবে ভাবছি যে, এত কাণ্ডের কীই বা দরকার ছিল। এটা যেন জেদের মধ্যে পড়েই করা হ'ল না কি? সত্যিই যদি তোমার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'ত, তাহ'লে কি ভয়ঙ্কর কিছু করতে তুমি? দু-চারদিন মনে একটু কষ্ট হ'ত, তারপর আবার সব ভুলে মনের সুখে ঘরকন্না করতে—

বিনয় হাসিল।

প্রতিমাও হাসিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, আর তুমি? তুমিই কি আর ভয়ঙ্কর কিছু করতে?

তাচ্ছিল্যের সুরে বিনয় বলিল, কিছু না, কিছু না। জীবনে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আছে নাকি? আমিও ঐ দুদিনেই ভুলতুম।

হঠাৎ প্রতিমার মুখের দিকে চোখ পড়িতে কণ্ঠে অস্বাভাবিক রকমের চাপল্য আনিয়া বিনয় কহিল, সে যাক্ গে, যখন অত কিছু হয়নি—তখন আর চিন্তা কি? যা হয়েছে—তা না হ'লে কি হ'ত, সে কথা এখন থাক্—।

বিনয় যত সহজে কথাটা উড়াইয়া দিল, প্রতিমা ততটা সহজে পারিল না। সে মনে মনে গভীর আঘাত পাইল। সে বাঙালীর ঘরের মেয়ে হইয়া বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ অমতে, লোক-লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া, সমাজের ভয় না করিয়া একান্তভাবে বিনয়কে পাইবার জন্য যে সাধনা করিয়াছে—এই কি তাহার পরিণাম? কী না করিয়াছে সে! কোন লাঞ্ছনা, কোন বাক্যবাণকে সে গ্রাহ্য করে নাই—ভবিষ্যতের কোন ভাবনা সে ভাবে নাই। সম্পূর্ণভাবে সেই দ্বাপরের গোপিনীদের

মতই নিজেকে সে সঁপিয়া দিয়াছে বিনয়ের পায়ে—সে কী এই জন্ম? তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অথচ বিনয়, যে বিনয়কে গত দুই বৎসর ধরিয়া অহর্নিশি স্বপ্ন দেখিয়াছে সে, সে ত' এমন ছিল না! প্রতিমার মনে পড়িল তাহার প্রথম কৈশোরের কথা। ঘরে পড়া হয় না বলিয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে বিনয় ঘোর শীতেও ভোরবেলা ছাদে পড়িতে উঠিত—বই হাতে করিয়া সে পায়চারী করিত আর অন্যমনস্কভাবে মুখস্থ করিতে করিতে চাহিয়া থাকিত পাশের বাড়ির দিকে—কখন প্রতিমা তাহাদের ছাদে উঠিবে বা ভিতরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবে এই আশায়। শুধু এইটুকুর জন্যই সে সন্ধ্যার পর অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও ছাদ ছাড়িতে চাহিত না; ইহার জন্য মা কত অনুযোগ করিয়াছেন, হ্যাঁরে, এত রাত অবধি হিমে থাকিস কেন? অন্ধকারে কী লেখাপড়া হয়?...সে সব কি শুধু স্বপ্ন? সব মিথ্যা!

কাজে-কর্ম্মে বা অন্য কোন প্রয়োজনে যখন দু'জনে দেখা হইত, প্রতিমার মনে পড়িল, বিনয় কোন কথা কহিতে পারিত না, শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া ঘামিত। কথা কহিলেও গলা কাঁপিত তাহার। অথচ তখন প্রতিমা কতই ছোট, এ-সবের মর্ম্ম সে কিছুই বুঝিত না। শুধু বিনয়কে দেখিতে তাহার ভাল লাগিত, এইটুকুই জানিত সে। প্রথম বিনয়ের কথা চিন্তা করিয়া বিনিদ্ররজনী যাপন করে যে দিনটিতে—সে দিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সেটা বি-এস-সি পরীক্ষার সময়, বোধ হয় কেমিস্ট্রী প্র্যাকটিক্যালের আগের দিন, বিনয়দের বাড়িতে সে আসিয়াছিল সিন্নি উপলক্ষ্যে, প্রশ্ন করিয়াছিল বিনয়কে; কেমন পরীক্ষা দিচ্ছ বিনুদা, ফার্স্ট হতে পারবে ত?

বিনয় উত্তর দিয়াছিল, ফাঁড়া আছে কালকের দিনটায়, যদি নার্ভাস না হই, তাহ'লে কোন ভয় নেই—

তাহার পর একটু থামিয়া গলা নামাইয়া বলিয়াছিল, না, ভালই দেব। নার্ভাস বোধ করলে একবার চোখ বুজে তোমাকে ভেবে নেব মনে মনে প্রতিমা, তাহ'লে মনে জোর পাব।

প্রতিমার কানের পাশ দুইটা সহসা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বেশী কথা কহিতে পারে নাই, শুধু বাড়ি আসিয়া সেদিন সে সারারাত জাগিয়াছিল, ঘুমাইতে পারে নাই। সেদিনই সে প্রথম অনুভব করে যে, বিনয়কে সে ভালবাসিয়াছে।… ,

তাহার পরের বৎসরই প্রতিমা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার আগে সে বিনয়ের মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল এ-বাড়ীতে। মাকে প্রণাম করিয়া সে বিনয়ের ঘরেও ঢুকিয়াছিল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, কৈ আশীর্ব্বাদ করলে না, বিনুদা ?

বিনয় হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, কি আশীর্ব্বাদ করব ?

—এই আমি যেন ভাল করে পাশ করি।

—সে ত করবেই—আমার যোগ্য হ'তে হবে ত তোমাকে !

সামান্য কয়েকটি কথা—হয়ত বা অর্থহীন, তবু যেন সেই-দিনই প্রতিমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল, সেই-দিনই যেন নিশ্চিতরূপে ঠিক হইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিমার যত কিছু সাধনার একমাত্র লক্ষ্য বিনয়ই।…সেদিন পরীক্ষা দিতে বসিয়া বারবার প্রতিমা উন্মনা হইয়া গিয়াছিল, প্রশ্নপত্রের মধ্যে যেন ছাপার হরপে কথা কয়টা ফুটিয়া

উঠিতেছিল বারবার—এবং হয়ত সেইজন্যই, প্রতিমার ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করা হয় নাই।...

কথাগুলি আগুপান্ত ভাবিতে ভাবিতে প্রতিমা যেন মনে জোর পাইল। এমনি করিয়া তিলে তিলে যে প্রেম তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি একেবারে অর্থহীন হইতে পারে? না, না, কখনই না।

সে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল বিনয়ের দিকে। সবল, বলিষ্ঠ, সুন্দর স্বামী তাহার, আনন্দময় ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে— এসব কী ছাইভস্ম ভাবিতেছে সে?.. বিনয়ও যদি তাহার কথা অহর্নিশি না ভাবিত, যদি তাহাকে পাইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হইত, তাহা হইলে কি শুধু প্রতিমার ইচ্ছায় এ বিবাহ সম্ভব হইত। বিনয়ও ত কম লাঞ্ছনা সহ্য করে নাই।...তা'ছাড়া এই যে ফুলশয্যার পরের দিনই এই ব্যবস্থা—এ সবই ত সে করিয়াছে। এখানে বধূকে ফেলিয়া রাখিয়া গেলে যে তাহার বাপ-মায়ের কাছে বহু গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে প্রতিমাকে, তাহা বিনয় জানিত। তাই সে জোর করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছে। অফিসের ছুটি এখনও আছে, কিন্তু বিনয় মিথ্যাকথা বলিয়া ঠিক বৌ-ভাতের পরের দিনটিতেই যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বহু অর্থব্যয় করিয়া ফার্স্ট ক্লাস 'কূপে' রিজার্ভ করা এবং দ্রুতগামী মেল ট্রেনের পরিবর্ত্তে এক্সপ্রেস ট্রেনে যাওয়ার ব্যবস্থা করা, যাহাতে তাহার মধুচন্দ্রমা ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে নিবিড়ভাবে জমে —এ সবই যে বিনয় করিয়াছে, তাহাতে ত সন্দেহ নাই। তাহার এত সাধনা, এত তপস্যার ফলকে বিনয় একান্ত করিয়া নিভৃতে অনুভব করিতে চায়!

অকস্মাৎ সশব্দে একটা উদ্গার তুলিয়া বিনয় নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিল। সেও এতক্ষণ কী ভাবিতেছিল, বোধ হয় ব্যাবার কথাই। সহসা এখন চমক ভাঙ্গিয়া প্রতিমাকে বলিল, তড়াতড়িতে, উদ্বেগে খাওয়া কিছুই হয়নি। তোমারও বোধ হয় তাই, না?

প্রতিমা লজ্জিত-নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, খাওয়ার ইচ্ছাই কি আছে এখন? ও-সব কথা এ ক'দিন মনেও ছিল না—

তা বটে। মোদ্দা ছুটোছুটি ক'রে তেষ্টাও পেয়েছে খুব। ফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢালো দেখি।

প্রতিমার মুখ শুকাইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে কহিল, চা ত নেই ওতে—

নেই? সেকি! বিনয়ের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

প্রতিমা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, মাকে দু-তিনবার বলেছিলুম; কিন্তু তিনি অত গ্রাহ্য করেননি। একেবারে বেরোবার সময় দেখলুম, তৈরি হয়নি তখনও—।

বেশ! অত্যন্ত বিরক্তকণ্ঠে বিনয় কহিল, বেশ হয়েছে। অত ক'রে যেটা বলে দিলুম, সেইটেই হ'ল না! ট্রেনে উঠলে আমার মুহুর্মুহু তেষ্টা পায়, তা ত জানো।...তুমি ত আর এ বাড়িতে একেবারে নতুন নও, মাকে না বলে নিজেও ত করে নিলে পারতে? তুমি যা আমার সংসার চালাবে, তা এই নমুনাতেই বুঝেছি!

প্রতিমা নতমুখে বসিয়া রহিল, জবাব দিল না। এ তিরস্কার তাহার প্রাপ্য নয়, সে এ বাড়ির পরিচিতা মেয়ে হইলেও আজ সে নববধূ, আজই যদি গৃহিণীকে ডিঙাইয়া গৃহিণীপনা করিতে যায় তাহা

হইলে চারিদিকে তাহার যে দুর্নাম রটিবে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই; এ সব কথাই সে বিনয়কে বলিতে পারিত, কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সামান্য ত্রুটিতে যে এমন মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিতে পারে, তাহাকে কী-ই বা বলিবে সে?

বিনয় তখনও আপন মনেই বকিয়া চলিয়াছে, সেই ব্যাণ্ডেলের আগে এ গাড়ি থামবে না, সেখানেও চা পাবো কি না, তার ঠিক কি? কেল্‌নারের লোক কি আর এই ঠিকদুপুরে গাড়ির ধারে আসবে খোঁজ কর্‌তে?

প্রতিমা একটু পরে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিয়া প্রশ্ন করিল, স্পিরিটল্যাম্প ত সঙ্গেই রয়েছে, জ্বেলে চা করে দেবো?

পারো ত দাও না, শুনছই ত যে আমার বিষম তেষ্টা পেয়েছে—

টিফিনের ঝুড়িতে সে স্পিরিটল্যাম্প, শিশিতে স্পিরিট, টিনের দুধ, চা চিনি সবই গুছাইয়া লইয়াছিল। অবশ্য এ নির্দ্দেশও বিনয়ের—ফুল-শয্যার রাত্রে সে এই সব নির্দ্দেশই দিয়াছে বেশি—অন্য কথা খুবই কম হইয়াছে তাহাদের।

প্রতিমা ছোট প্যানটা করিয়া কুঁজা হইতে জল লইয়া চাপাইয়া দিল। বিনয় তখন টাইম-টেব্‌ল্‌ দেখিতে ব্যস্ত ছিল, সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, বলি ও কি হচ্ছে! জানলাগুলো বন্ধ করোনি, এই বাতাসে কতক্ষণে জল গরম করবে?…আঁচ ত সব বাইরেই যাচ্ছে, প্যানের গায়ে লাগছে কৈ?

প্রতিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া সার্সিগুলো বন্ধ করিয়া দিল। দোষ তাহারই, বাস্তবিক এ কথাটা তাহারই ভাবা উচিত ছিল আগে, তবু

বিনয়ের তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে বিনয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া জল দেখিবার ছুতা করিয়া গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিল।...

চা প্রস্তুত হইল। পেয়ালাটা প্রতিমার হাত হইতে লইয়া একটা চুমুক দিয়া বিনয় আরামসূচক একটা ধ্বনি করিয়া কহিল, তোমার কৈ?

প্রতিমা মৃদুস্বরে কহিল, আমি এখন খাবো না। এমন সময়ে চা আমার ভাল লাগে না।

বিনয়ের ততক্ষণ আরও দু-এক চুমুক পেটে পড়িয়াছে। সে অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, তবু একটু খেলে পারতে—কদিন যা ট্রেন্ যাচ্ছে, তার ওপর আজ সকাল থেকে হুড়োহুড়ির ত শেষ নেই।...তোমার মুখটা বড্ডই শুকনো দেখাচ্ছে, শোও না একটু!

প্রতিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না.। এত কাণ্ডের পর, জীবনে এই প্রথম তাহারা নিভৃতে নিশ্চিন্তভাবে মিলিত হইয়াছে—সে কি ঘুমাইবার জন্য?

চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া বিনয় কহিল, তাহ'লে আমি একটু গড়িয়ে নিই, কি বলো?

শোও না—বলিয়া প্রতিমা আর একটু ধারে সরিয়া বসিল। সে ভাবিয়াছিল বিনয় বোধ হয় তাহার কোলেই মাথা দিয়া শুইবে, কিন্তু বিনয় সে ধার দিয়াই গেল না, বালিশ দু'টা ঠিক করিয়া সাজাইয়া সে বেশ ভাল করিয়াই গুছাইয়া শুইল।

এ-ও প্রতিমার একটা স্বপ্ন ছিল বৈকি! কাঁথার মত ঘন কালো চুল বিনয়ের, কতবার প্রতিমার লোভ হইয়াছে ঐ চুলের মধ্যে আঙুল

চালাইয়া বিনয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, কিন্তু এতদিন সুযোগ হয় নাই। এখন বিনয় তাহার কোলে মাথা দিলে সে নিশ্চয়ই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত, কিন্তু সামান্য বালিশের ব্যবধানে এমন একটা দূরত্ব রচিত হইল যে, তাহার ঠিক সাহসে কুলাইল না—মনে হইল কি জানি, যদি কিছু মনে করে বিনয় !

এই কথাটাই ভাবিতেছে সে, সহসা বিনয়ের নাক-ডাকার শব্দে প্রতিমার চমক ভাঙিল। বিনয়ের যে নাক ডাকে—এটা প্রতিমা জানিত না। সে একটু বিস্মিত হইয়াই চাহিল বিনয়ের দিকে। অঘোরে ঘুমাইতেছে, ক'দিনের অত্যাচার আর রাত্রি-জাগরণে চোখটা তাহার অনেকখানিই বসিয়া গিয়াছে, ফলে গালের উপরের হাড় দুইটা দেখাইতেছে বেশী রকমের উঁচু, আর নাকটাও যেন তাহার অস্বাভাবিক মোটা।

ঘুমন্ত বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ প্রতিমার মনে হইল—এ যেন সে সুন্দর বিনয় নয়—এ যেন আর কেহ !

ছি, ছি—এ কী ভাবিতেছে সে ! প্রতিমা যেন নিজের উপরেই বিরক্ত এবং লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার কি হইয়াছে, এ সব কি ছাই ভস্ম তাহার মনে হইতেছে ?...সে বাথরুমে গিয়া মুখে চোখে জল দিয়া আসিয়া বসিল। এবারে জোর করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিবে, অন্য কথা ভাবিবে।...

ব্যাণ্ডেল স্টেশনে গাড়ি থামিতেই বিনয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল প্রতিমা তাহার শিয়রে বসিয়া

বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একবার ভাবিল সে তাহাকে ডাকিয়া ভাল করিয়া শোয়াইয়া দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল তাহাতে ঘুম ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী এবং একবার ঘুম ভাঙিলে লজ্জায় সে আর হয়ত ঘুমাইতে চাহিবে না। উপরি-উপরি তিন-চার রাত্রিই ত বলিতে গেলে জাগিয়া আছে বেচারী, ঘুমাইতে পারে ত ঘুমাক।

রিফ্রেশমেন্টের চাপরাশী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে চা আনিতে ফরমাস করিয়া বিনয় একটা সিগারেট ধরাইল। ট্রেনে উঠিলেই তাহার মুহুর্মুহু চা লাগে। এমনিই সে চা যে একটু বেশী খায় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই বদভ্যাসের জন্য আগে আগে বাবা কত তিরস্কার করিয়াছেন, তবু সে অভ্যাসটা ছাড়িতে পারে নাই।...

চা খাইতে খাইতে বাবার কথাই মনে পড়িল। এ কয়দিন তিনি তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাই বলেন নাই। আজও যাত্রার সময় সে যখন প্রণাম করিতে গেল তিনি তখন গম্ভীর হইয়াই রহিলেন, শুধু 'গিয়ে চিঠি দিও' এই তিনটি শব্দ ছাড়া একটি কথাও কহিলেন না। অথচ, বিনয়ের মনে পড়িল, বাবা বরাবরই তাহার সহিত গল্প করিতে ভালবাসেন। যখন সে নিতান্ত ছোট, তেজারতির অ-আ-ক-খও জানিত না, তখনই আহারে বসিয়া বাবা প্রত্যহ তাহার সহিত বৈষয়িক কথা আলোচনা করিতেন। একমাত্র ছেলে বলিয়া নয় শুধু, ছেলেটি তাঁহার বন্ধুর মতই আত্মার সহিত জড়াইয়া থাকিত বলিয়া—তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার কত গর্ব্ব, কত আনন্দ!

নাঃ, বাবাকে বড্ডই আঘাত করা হইয়াছে। কোথাকার জমিদারের

এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা দেখিয়া তিনি পছন্দ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে কথাও একরকম দেওয়া হইয়াছিল। কারণ তিনি জানিতেন, বিনয় কখনও তাঁহার ব্যবস্থার উপর কথা কহিবে না। অথচ—সে গর্ব্ব তাঁহার ধূলিসাৎ হইল, মাথা হেঁট করিয়া তাঁহাকে জানাইতে হইল, এভাবে কথা দেওয়ার কোন অধিকারই তাঁহার ছিল না।... সে মেয়ের ফোটোও বিনয় দেখিয়াছে। সত্যই সে রূপসী, আর নাকি অসম্ভব ঠাণ্ডা—অন্তত মা তাই বলেন। তাহার কাছে, বিনয় ঘুমন্ত প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রতিমা কিছুই নয়। প্রতিমার রূপ-গৌরব কোনদিনই ছিল না। রং বিনয়ের চেয়ে দুই-তিন পোঁচ কালো, মুখেরও কোথাও কোন সৌষ্ঠব নাই! চোখ ছোট, থুৎনির কাছটা একটু বেশী সরু, চোখের কোলে অস্বাভাবিক কালী। না, রূপ দেখিয়া পছন্দ করার মত কিছু নাই। কীই বা আছে, গুণ? তাও ত এই নমুনা। যে বিনয় তাহার জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এত কাণ্ড করিয়া, বলিতে গেলে সমস্ত সংসারের সহিত বিবাদ বাধাইল—তাহার সামান্যতম ইচ্ছাটারও মর্য্যাদা রাখিতে পারিল না প্রতিমা, সেখানেও এত ভুল! বাপ-মায়ের অভিশাপ কুড়াইয়া, সকলকে ত্যাগ করিয়া এক মাত্র তাহাকে বাছিয়া লইবার কী মূল্য দিল প্রতিমা? ছি!...

বিনয় আর একটা সিগারেট ধরাইয়া কাগজখানা টানিয়া লইল। প্রতিমা অঘোরে ঘুমাইতেছে, মুখটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে, চোখের পল্লব অর্দ্ধনিমীলিত, যেন মড়ার মত ঘুম। আশ্চর্য্য, ইহারই জন্য কি সে পাঞ্জাব মেলে না গিয়া পাঞ্জাব এক্সপ্রেস বাছিয়া লইল, যাহাতে দীর্ঘ দুটি রাত্রি-দিন তাহারা নিবিড় আনন্দে, অভিনব পরিবেশের মধ্যে কাটাইতে

পারে—সুদীর্ঘ স্বপ্নের মত দুটি রাত্রি-দিন?...প্রতিমা ত ঘুমেই অচেতন। এত ঘুম!...এই অলঙ্ঘ্য বাধা-বিপত্তির পরে প্রথম মিলনের ক্ষণটিতে ঘুমাইতে পারিল সে?...অবশ্য বিনয়ও চোখ বুজিয়াছিল সত্য কথা, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও রাত্রি জাগরণে চোখটা না বুজিয়া পারে নাই, কিন্তু সে কতক্ষণই-বা, কয়েক মিনিট পরেই ত সে উঠিয়া বসিল। অথচ প্রতিমা—

আচ্ছা, কী দেখিয়া প্রতিমাকে এত ভালবাসিয়াছিল সে? ছেলে-মানুষী ত কম করে নাই প্রতিমাকে কেন্দ্র করিয়া!—কেন? প্রতিমার কণ্ঠস্বরের আভাসে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে গত চার বৎসরের প্রতিটি দিন-রাত্রি। এমন কী মূল্য আছে তাহার?...বিনয় অনেক ভাবিয়া দেখিল, না, কোন মূল্যই নাই, এ তাহার নিজেরই প্রথম যৌবনের অপরিসীম তৃষ্ণা, হাতের কাছে আর কোন মেয়ে ছিল না বলিয়াই একমাত্র যে কিশোরী চোখের সামনে দেখা দিয়াছে, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সে দিনের পর দিন মিথ্যা স্বপ্ন রচিয়াছে!...

কোন্ একটা স্টেশনের বাহিরে সিগ্‌নাল না পাইয়া গাড়িখানা হঠাৎ থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিনয়েরও যেন চমক ভাঙিল। ছি ছি, এ সব কি চিন্তা তাহার।...এমন কথা তাহার মাথায় গেল কি করিয়া। প্রতিমার সম্বন্ধে এমন সব নিষ্ঠুর চিন্তা তাহার মাথায় আসে! আছে বৈকি প্রতিমার মূল্য।...প্রতিমাও ত কম করে নাই তাহার জন্য। সে পুরুষ, মোটা টাকা মাহিনা পায়, বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাহার পক্ষে বাপ-মায়ের সহিত ঝগড়া করা সোজা; কিন্তু প্রতিমার ত এ সব কোন সুবিধাই ছিল না। তবু সে করিয়াছে, সে কী একেবারেই নিরর্থক।

শুধু কি তাই? মনে আছে একবার তাহার মায়ের-অনুগ্রহ হইয়াছিল। খুব বেশী রকমের নয়, তবু প্রতিমার সে কী কান্না, আর কাছে থাকিবার জন্য সে কি আকুলতা! যে রোগে সবাই ভয় পায়, সে রোগের সেবা করিতে পারিল না বলিয়া প্রতিমার সেদিনের সে কান্না কি ভুলিবার? প্রতিমা তাহাকে খুবই ভালবাসে, হয়ত সর্ব্বস্ব দিয়াই ভালবাসে, সামান্য ত্রুটি ধরিয়া সে প্রেমের অমর্য্যাদা করা অমানুষের কাজ!

বিনয় চঞ্চল হইয়া নড়িয়া বসিল, অকস্মাৎ যেন তাহার সেই প্রথম যৌবনের আবেগের সঞ্চার হইয়াছে তাহার মনে—এতদিন পরে। প্রতিমার একান্ত প্রেমের সমস্ত নিদর্শনগুলি ভীড় করিয়া মনে আসিতেছিল। সে বোধ হয় গত বছরের কথা, কী একটা উপলক্ষ্যে দুটি পিতার মধ্যে বিবাদটা কিছুদিনের জন্য বেশী রকম পাকিয়া উঠিয়াছিল, দুইজনে বহুদূর হইতে ছাড়া দেখা-সাক্ষাৎ হইত না—সেই সময়েই একদিন হঠাৎ একটা নির্জ্জন অবসরে দুটি বারান্দায় দাঁড়াইয়া দুইজনে মিনিট খানেকের জন্য কথা কহিবার অবসর পাইয়াছিল। প্রতিমা বলিয়াছিল বিনয়কে, আমি আমাদের গলির ঐ পাথরগুলোকেও আজকাল হিংসে করতে শুরু করেছি।

বিস্মিত হইয়া বিনয় প্রশ্ন করিয়াছিল, কেন?

—তবুত তুমি রোজ ঐ পাথরগুলো মাড়িয়ে যাও, ওরা ত তোমাকে ছুঁতে পায়!

সেদিনের কণ্ঠস্বর আজও মনে পড়িয়া বিনয়ের সারা দেহে রোমাঞ্চ হইল।...না, সে প্রতিমাকে বিবাহ করিয়া একটুও ভুল করে নাই।

সে কাগজটা ফেলিয়া দিয়া ঝোঁকের মাথায় একেবারে ঘুমন্ত প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিল।

ওগো শুন্‌ছ! ওঠো না, কত ঘুমোবে?

প্রতিমা গাঢ় ঘুম হইতে আচম্বিতে জাগিয়া প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। রক্তাভ বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া আচ্ছন্ন ভাবে চাহিয়া রহিল বিনয়ের মুখের দিকে। বিনয়ের অসহিষ্ণু আবেগ এই মূঢ় বিহ্বলতাতে ঠেকিয়া যেন ধাক্কা খাইল। সে অপ্রসন্ন মুখে প্রতিমাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার নিজের কাগজটা তুলিয়া লইল।

কিন্তু প্রতিমার সে আচ্ছন্নভাব মুহূর্ত্ত-কয়েক পরেই কাটিয়া গেল। সে সবেগে চোখ দুইটি রগড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তারপর লজ্জিতভাবে কহিল, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, না?

বিরক্তি বিনয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, অতি কষ্টে চিত্ত দমন করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, জবাব দিল না। প্রতিমাও তাহার অন্ধকার মুখের দিকে চাহিয়া আর কথা কহিতে সাহস করিল না। অপরাধটা সহসা এক মিনিটের মধ্যে কি করিয়া এবং কোথায় ঘটিয়া গেল বুঝিতে না পারিয়া মুখে চোখে জল দিবার জন্য বাথরুমে চলিয়া গেল।

একটু পরে ফিরিয়া কতকটা ভয়ে ভয়েই কহিল, চা একটু তৈরি করব, খাবে?

কাগজটা হইতে মুখ না তুলিয়াই বিনয় জবাব দিল, তুমি খাও ত করো, আমার দরকার নেই!

আবার চুপচাপ। পাশাপাশি বসিয়া দুজনে দু'দিকে চাহিয়া

রহিল। ট্রেন চলিতেছে হু-হু করিয়া, কোন্ স্টেশন পার হইয়া গেল প্রতিমার তাহা জানা নাই—এমনভাবে আরও দুইটা দিন কেমন করিয়া কাটিবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। ইহার চেয়ে বাড়িতে থাকিলে ঢের ভাল হইত, তবু হাতে কাজ থাকিত, এত কাছাকাছি, অথচ এত দূরে ভাল লাগে না।

··একটু পরেই ট্রেনের গতি কমিয়া বর্দ্ধমান স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। হৈ-চৈ, লোকজন, প্রতিমা তবু একটু যেন প্রাণ পাইল। রামশরণ আসিল খোঁজ করিতে, কিছু চাই কি না। বিনয় তাহাকে টাকা দিয়া বলিল, যা ঐ স্টল থেকে ভাল মিহিদানা কিনে নিয়ে আয়, আর চা দিতে বল কেল্‌নারের লোককে—

রামশরণ চলিয়া গেল। দুজনেই প্লাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়া বসিয়া—বিষম ভীড়, পেষাপিষি চলিতেছে সামান্য মাত্র স্থানের জন্য। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহারই মধ্যে যেন দিশাহারা হইয়া আসিয়া তাহাদের গাড়ির হাতলে হাত দিলেন।

বিনয়ের সমস্ত বিরক্তিটা তাঁহার উপর গিয়া পড়িল, ওকি মশাই, দেখতে পাচ্ছেন না এটা ফার্স্ট ক্লাস, কানা নাকি?

কণ্ঠস্বর যেমন রুক্ষ, তেমনি অপমানকর। বৃদ্ধটি একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, দেখেছি, আমার অবিশ্যি সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট, কিন্তু কি করব, জায়গা পেলুম না কোথাও। এখানেই উঠি, না হয় ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়াই দেব। যাবো সামান্য পথই, রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত।

তিনি হাতল ঘুরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বিনয় উঠিয়া গিয়া রূঢ়ভাবে

তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া কহিল, দেখেছেন ত, আর একটু দেখতে হ'ত! এটা রিজার্ভড্ গাড়ি।

ভদ্রলোক অপ্রস্তুতভাবে 'কিছু মনে করবেন না' বলিয়া আবার ভিড়ের মধ্যে ছুটাছুটি শুরু করিলেন। বিনয়ের এই অকারণ রূঢ়তায় প্রতিমার সমস্ত মনটা বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর থাকিতে না পারিয়া কহিল, ভদ্রলোক সামান্ত পথ ত যেতেন, একটু উঠতে দিলেই হ'ত।...বুড়োমানুষ হয়ত উঠতেই পারবেন না—

তেমনি তিক্ততার সহিতই বিনয় জবাব দিল, অত দয়া-দাক্ষিণ্য করবার জন্মে এক গাদা টাকা দিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করিনি।...যত সব ননসেন্স!

প্রতিমা চুপ করিয়া গেল। ইহার সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই। শোভনতাবোধ যুক্তি দিয়া মাথায় ঢোকানো যায় না। এই লোকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করিয়াছে—বিশ্বাস করিতেও যেন প্রবৃত্তি হয় না।...অথচ, উচ্চশিক্ষিত স্বামীই তাহার আবাল্য কাম্য ছিল। সে যখন নিজে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে সেই সময়ে বাবা একটি সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন। পাত্রটি আই-এ ফেল, সরকারী চাকরী করে। মাঝারী গৃহস্থ—নিতান্তই সাধারণ পাত্র। সমস্ত শুনিয়া প্রতিমা নাক তুলিয়া বলিয়াছিল, কলকাতা ইউনিভার্সিটির আই-এ যে পাশ করতে পারেনি, তাকে বিয়ে করবার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল বাবা!

রমেশবাবু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিয়াছিলেন, লেখাপড়া শেখেনি বটে কিন্তু ছেলেটি বড় ভদ্র রে!

হ্যাঁ ভারি ভদ্র, লেখাপড়া শেখেনি সে আবার ভদ্র!

রমেশবাবু খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমিও ত বেশী লেখাপড়া শিখিনি মা, তাহ'লে আমিও অভদ্র বল্! আমার মত বয়স যখন হবে তখন বুঝবি যে, অন্তত আমাদের দেশে শিক্ষা ও ভদ্রতা এক নয়—

প্রতিমা অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, জবাব দিতে পারে নাই। সে বিবাহ অবশ্য হয় নাই, কিন্তু আজ এতদিন পরে সেই কথাগুলিই মনে পড়িয়া তাহার চোখে জল আসিয়া গেল।...

রামশরণ ইতিমধ্যে মিহিদানা লইয়া আসিল। প্রতিমা তাহার হাত হইতে চ্যাঙারীটা লইয়া প্লেটে করিয়া অর্দ্ধেকেরও বেশী সাজাইয়া বিনয়ের সামনে দিল। রামশরণকেও একটা পাতায় করিয়া কিছু দিয়া বাকীটা সরাইয়া রাখিতেছে দেখিয়া বিনয় প্রশ্ন করিল, তুমি নিলে না?

প্রতিমা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমার এখন খেতে ইচ্ছে নেই।

বিনয় বিদ্রূপের সুরে কহিল, তা বটে।...তোমাদের আবার খাবার ইচ্ছে না থাকাটাই চাল।...আমি বাপু কিন্তু তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না। ট্রেনে উঠলেই আমার ক্ষিদে পায়—

প্রতিমা শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল, তুমি খাও না, সত্যিই আমার ক্ষিদে নেই—

বিনয় তখন মুঠা মুঠা মিহিদানা মুখে পুরিতেছে। সেই অবস্থাতেই, প্রায় রুদ্ধস্বরে বলিল, না খাও ত আমাকে আর ছুটি দিতে পারো—

—নাও না! বলিয়া প্রতিমা তাহার প্লেট পুনরায় ভরিয়া দিল।

তাহার পর রূঢ়কণ্ঠে কহিল, খাবারও ত ঢের রয়েছে সঙ্গে, খাবে কিছু? বার করে দেব?

না-না, বিনয় প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িল, ওসব খাওয়ার সময় ঢের পড়ে রয়েছে, এটা মিহিদানা খাবার ক্ষিদে, বুঝলে না—

প্রতিমা আর কথা না কহিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। বিনয়ের সমস্ত মুখ-ভাবে যে একাগ্র লোলুপতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখা অন্তত প্রতিমার পক্ষে কঠিন।

একটু পরেই জলের গ্লাসটা একনিঃশ্বাসে শেষ করিয়া বিনয় কহিল, দাও, আর একটু জল দাও—

কুঁজা ছোট, জলও বোধহয় পুরা ছিল না, তাহার উপর চা-পর্ব্বে অনেকটা জল বাজে খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন গড়াইতে গিয়া আধ গ্লাসের বেশী হইল না।

বিনয়ের কণ্ঠস্বর আবার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, ওকি, জল আর নেই?

প্রতিমা অপরাধীর মত নতমুখে জবাব দিল, না।

আর এক পর্দ্দা গলা চড়াইয়া বিনয় কহিল, তা সেটা বুঝি আর একটু আগে বলতে পারলে না। রামশরণকে দিয়ে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল না তোমার?...মানুষের খাবার জল চাই; সেটাও হুঁস থাকে না?...সেই অণ্ডালে গিয়ে গাড়ি আবার থামবে—ততক্ষণ খাই কি?... তুমি মানুষ না জন্তু?

সে রাগ করিয়া মিহিদানার প্লেটটা সুদ্ধ জানলা গলাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর গ্লাসের জলটুকুতে হাত ধুইয়া চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

প্রতিমা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার চোখের জলও এই তিরস্কারের কাঠিন্যে এবং আকস্মিকতায় যেন শুকাইয়া গিয়াছিল।

গাড়ি হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া পড়িল, অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা। নির্জ্জন গাড়ির মধ্যে দুইটি সদ্য বিবাহিত নর-নারী তেমনি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া। অথচ এই যাত্রার কী স্বপ্নই না দেখিয়াছে ইহারা এই কয়দিন ধরিয়া। কেন এমন হইল, কাহার দোষে —তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। শুধু যে নির্জ্জনতা আজ সকাল পর্য্যন্ত দুজনের একান্তকাম্য ছিল, এখন তাহাই যেন অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইল।

কে জানে, হয়ত তাহাদের বাসা বাঁধিবার কল্পনা, ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্নও এমনি ভাবেই খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে।

সংশয়

অতি সাধারণ একখানি চিঠি। সরকারী খামে মোড়া; বাহির হইতে যতটা বোঝা যায় চিঠির আয়তনও বেশী বড় নয়। টানা পুরুষালী হাতে ললিতার নাম-ঠিকানা লেখা। অর্থাৎ কোন প্রকার অসাধারণত্বের দাবী কোথাও তাহার মধ্যে ছিল না।

আর, সমর যখন হাতে করিয়া চিঠিখানা লইল পিওনের হাত হইতে, তখনও সে তাহার জন্ত এক মুহূর্তের বেশী মাথা ঘামায় নাই। অফিসের তখন বেলা হইয়া গিয়াছে, স্নানে নামিয়া সবে একঘটি জল মাথায় ঢালিবে, এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। বিরক্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল চিঠি—ঐ একখানি খামে মোড়া নিতান্ত সাধারণ চিঠি। তাও ললিতার নামে। সে অতি কষ্টে হাতের তেল বাঁচাইয়া দুটিমাত্র আঙুলের প্রান্তভাগ দিয়া খামখানা ধরিয়া হাঁক দিল, ওগো শুন্‌ছ?

তাহার পর ললিতা উপস্থিত হইলে 'তোমার চিঠি' বলিয়া খাম-খানা রকের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার কলতলায় চলিয়া গেল।...তাহার পর আর সে কথা তাহার মনেও ছিল না। ঠিক

তেইশ মিনিটের মধ্যে স্নান, আহার, প্রসাধন সারিয়া বাসে চাপিতে হয় যাহাকে, তাহার পক্ষে আর মনে রাখা সম্ভবও নয়।

কিন্তু তবু মনে পড়িল। অফিসে পৌঁছিয়া দেখিল হাতে কোন কাজ নাই। বেলা বারোটার আগে সেদিন সাহেব আসিবেন না, ফোন করিয়া জানাইয়াছেন; তিনি না আসিলে ডাকও খোলা হইবে না, আর ডাক না খুলিলে তাহার কোন কাজও থাকিবে না। কারণ সে সাহেবের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী। চিঠির জবাব দেওয়া, টাইপ করা, চিঠি পাঠানো প্রভৃতি তাহার হাতে। যাহাই হউক—সে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া টেবিলের প্রান্তে হাঁটু দুইটা তুলিয়া চেয়ারে কাৎ হইয়া খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। তাহার নিজস্ব চিঠি, অতি পরিচিত একটি হাতের লেখা, গোলাপী খাম।

সমর সোজা হইয়া বসিল। সাতদিন ধরিয়া এই চিঠির প্রত্যাশা করিতেছিল সে—এইটুকুই এখন তাহার জীবনের একমাত্র রোম্যান্সে ঠেকিয়াছে। মাধবী তাহার বৌদিদির বোন। সে-বার অসুখ হইতে উঠিয়া ভাগলপুরে যখন হাওয়া বদ্‌লাইতে যায়, বৌদিদির বাপের বাড়িতেই মাস দুই থাকিতে হইয়াছিল। অবশ্য বৌদিদিই সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এক রকম জোর করিয়াই। সেই সময়েই মাধবীর সহিত তাহার পরিচয় হয়, ক্রমে তাহা অন্তরঙ্গতায় দাঁড়ায়। দুজনের বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল একবার, কিন্তু সমরের মা একবাড়িতে দুই কুটুম্ব করিতে রাজী হন নাই, বরং ভয় পাইয়া ছেলেকে কলিকাতায় ফিরিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

তাহার পর আর মাধবীর সহিত সমরের বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই—এক-আধবার দুই-একঘণ্টার জন্য হয়ত হইয়াছে, তাহাও সকলকার সামনে। কিন্তু পত্র-ব্যবহারটা এখনও বজায় আছে। প্রকাশ্যভাবে উভয়ের প্রেমালাপ কখন হয় নাই, চিঠিতেও সে রকম ভাষা কখনও লেখা হয় না, তবু দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন ব্যথার সুর একটু রহিয়া গিয়াছে। আর সেইটুকুই সমরের মনে হয়, তাহাদের জীবনের রোমান্স!...সমর অবসর সময়ে একটু-আধটু সাহিত্যচর্চ্চা করে, মাধবীরও সে রোগ আছে—দুজনের চিঠিতে সেই সব কথাই থাকে বেশী। সে হিসাবে চিঠিগুলি নির্দ্দোষ, কিন্তু সমর সেই চিঠিগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই কত কি রঙীন স্বপ্ন দেখে—যদিচ তাহা সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মাধবী এখনও কুমারী আছে বটে কিন্তু সমরকে বিবাহ করিতে হইয়াছে কতকটা বাধ্য হইয়াই—

অবশ্য সেজন্য সমরের বিশেষ দুঃখ নাই। ললিতাকে বিবাহ করিয়া সে এক রকম সুখীই হইয়াছে; এই দুই বৎসরে মাধবীকেও প্রায় সে ভুলিতে বসিয়াছে। হয়ত একেবারেই ভুলিয়া যাইত যদি না এই পত্রগুলি কুড়ি-পঁচিশ দিন বা মাসখানেক অন্তর আসিতে থাকিত এবং সমরকেও কতকটা নেশায় পড়িয়া তাহার জবাব লিখিতে হইত। কিন্তু তবু, কে জানে কেন, এই চিঠিগুলির কথা সমর ললিতাকে জানাইতে পারে না। কিসের একটা সঙ্কোচ বাধা দেয় যেন। এমন কি আগে আগে চিঠি বাড়িতে আসিত, দৈবাৎ ললিতা ভুল করিয়া একখানা চিঠি খুলিয়া ফেলায় সে মাধবীকে অফিসের ঠিকানাতেই চিঠি দিতে বলিয়াছে।...

সময় মাধবীর চিঠিখানা বার-দুই আদ্যোপান্ত পড়িল। ছোট চিঠি, তাহার চিঠিগুলি ক্রমেই ছোট হইয়া আসিতেছে। আর বাস্তবিক, বলিবারই বা কি আছে তাহাদের। সাহিত্য আর সাহিত্য, কত করা যায়! সমর একটু ম্লান হাসিল। দুইদিন পরে আরও ছোট হইবে, আর ইতিমধ্যে যদি মাধবীর বিবাহ হইয়া যায় তাহা হইলে ত কথাই নাই, বাধ্য হইয়াই বন্ধ করিতে হইবে।...

চিঠিখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সহসা সমরের মনে পড়িয়া গেল, সকালের চিঠিখানার কথা। কে লিখিল কে জানে। হস্তাক্ষর সমরের সম্পূর্ণ অপরিচিত, হয়ত কোন আত্মীয়-স্বজন হইবে, সমর এখনও ত সকলকে চেনে না।

চিঠি ছেঁড়া শেষ করিয়া সমর আবার সংবাদপত্রে মন দিল। হিটলারের রাশিয়া অভিযান, চার্চিলের বক্তৃতা, রুজভেল্টের ভ্রূকুটি এবং তোজোর চাতুরীর বহু সংবাদ পাঠ করিবার পরও মনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া কিন্তু সেই চিঠিতেই ফিরিয়া আসিল। সত্যই ত, ললিতার বাপের বাড়ির এবং মামার বাড়ির প্রায় সকলকার হাতের লেখার সঙ্গেই ত তাহার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে, এত টানা লেখা কখনও ত চোখে পড়ে নাই। কে লিখিল এ চিঠি? ললিতাও অন্যদিন নিজেই বলে—'অমুক চিঠি দিয়াছে' 'এই লিখিয়াছে', আজ ত কিছু বলিল না।...

না বলুক, সমর কখনই অপরের গোপনতার মধ্যে নাক-গলানো ভালবাসে না, ব্যক্তি-স্বাধীনতার সে বড় ভক্ত। তাহার চিঠি-পত্র কেহ দেখিলে যেমন সে রাগ করে, অপরের চিঠি সম্বন্ধেও তেমনি কোনও ঔৎসুক্য তাহার নাই। সেবার ললিতা মাধবীর চিঠিখানা ভুল

করিয়াই ছিঁড়িয়াছিল, তবু সমরের কাছে সেজন্ত তাহাকে কম লাঞ্ছনা সহিতে হয় নাই। অনেক কটু কথাই সে বলিয়াছিল, ললিতার চক্ষু সজল হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে তাহাকে রেহাই দেয় নাই।

সমর আবার খবরের কাগজে মন দিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী জাপানকে ভয় দেখাইয়াছেন। চিয়াং কাই সেক চিঠি পাঠাইয়াছেন নেহেরুর কাছে—বাজে সব খবর!...আচ্ছা, ললিতার কোন বন্ধু পত্র দেয় নাই ত? নিজে ইংরাজিতে ঠিকানা লিখিতে পারে নাই বলিয়া স্বামীকে দিয়া লিখাইয়াছে, তাহাও ত হইতে পারে?...কিন্তু সে রকম কোন বন্ধুর কথাও ত সমর ইতিপূর্ব্বে শোনে নাই, বা চিঠি আসিতেও দেখে নাই। কে লিখিল এ চিঠি কে জানে!...

সাহেব আসিয়া পড়িয়াছেন, ডাক খোলা হইবে। সে তাড়াতাড়ি সাহেবের ঘরে গেল, হাতে নোট বুক ও পেন্সিল। সাহেব কতকগুলি চিঠি নীরবে পড়িলেন, সেগুলি ব্যক্তিগত চিঠি। কতকগুলি চিঠি সরবে পড়িলেন, এগুলির জবাব সমরই দিতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। আর কতকগুলি জবাব তিনি নিজেই বলিয়া দিলেন। কিন্তু সমর সেদিন যেন বড় বেশী অন্তমনস্ক, বার বার ভুল হইতে লাগিল। সাহেব ত রীতিমত ধমকই দিলেন একবার। সমর লজ্জিত হইয়া নিজের সীটে ফিরিয়া আসিল।

আশ্চর্য্য! কোথাকার কে একজন চিঠি লিখিল, তাহাও আবার অপরকে, মাঝখান হইতে সমরের এত মাথা-ব্যথা কেন? সে এই অনাবশ্যক কৌতূহলের জন্ত নিজেকে মনে মনে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিল। এ কী অভদ্রতা! এই ত সে সেদিনও ললিতাকে শুনাইয়া দিয়াছে,

চিঠি যাহারই আসুক না কেন, অপরের দেখা উচিত নয়। পোস্টকার্ড হাতে পড়িলেও না পড়িয়া অধিকারীকে দেওয়া উচিত। পরের চিঠি পড়া আর আড়িপাতা একই রকমের বদ্ অভ্যাস। আর আজ তাহার নিজেরই এই দুর্ব্বলতা, ছিঃ!

অবশ্য ললিতাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেই সব গোল চুকিয়া যায় বটে, কিন্তু এত কাণ্ডের পর এ কৌতূহল আর প্রকাশ করা যায় না। ললিতা কি মনে করিবে!...কথাটা ভাবিতেও সমরের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়া অবধি এই বিষয়টি লইয়া কম বক্তৃতা ত সময় দেয় নাই তাহাকে! বোধ হয় প্রত্যহ একবার করিয়া বলিয়াছে, আর সেদিন ত কথাই নাই—কী বলাই বলিয়াছে সে বেচারীকে। ললিতার শুধু কাঁদিতে বাকী ছিল। এত কাণ্ডের পর আর ললিতাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না, চিঠিখানা কাহার!

আর দরকারই বা কি! আর একবার সমর মনকে শাসাইল—কী একটা তুচ্ছ কথা লইয়া ভাবিতে বসিল সে। তাহার আজ মাথা খারাপ হইল নাকি?...সে জোর করিয়া কাজে মন দিল।

কাজ তাহার কমই। সাহেব ঠিক তিনটায় চলিয়া যান, আর ঘণ্টাখানেক বসিয়া এটা-ওটা নাড়াচাড়া করিয়া সেও উঠিয়া পড়ে। ওটুকু বসিতেই হয়, নহিলে অন্য কেরাণীদের চোখ টাটাইবে।...সেদিন সে বরং মিনিট দশেক আগেই উঠিল। পথে এটা ওটা খুচরা বাজার সারিয়া সে সোজা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। এটাও অভিনব ব্যাপার বলিতে হইবে, কারণ অন্যদিন এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া সে একেবারে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরে।

ললিতা অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, কী ভাগ্যি! এত যে সকাল সকাল আজ?

সমর জবাব দিল, এমনিই! বিশ্রী গরম পড়েছে, আজ আর ঘুরতে ভাল লাগল না।

তখনও যে তাহার চিঠিখানা সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল, তাহা নিজের কাছেই স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু তবু ছিল। কেন, তাহা সে নিজেই জানে না, তবু সমস্ত কথা, সমস্ত চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে ঐ একখানি চিঠি বার বার উঁকি মারিতেছিল।···অথচ কিছুতেই সে একটা নিতান্ত সাধারণ সহজ প্রশ্ন ভরসা করিয়া ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। নিজের বিবেকের কাছেই লজ্জায় মরিয়া যাইতে হইবে যে!

অনেকক্ষণ পরে, মনে মনে বহুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিবার পর হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, মায়ের চিঠি আসেনি আজ, না?

সমরের মা তাহার ছোট ভাইকে লইয়া বোনের বাড়ি গিয়াছেন দিনকয়েকের জন্য। এমনিই তিনি বড় একটা চিঠি দেন না, তাহার উপর সবে কালই একখানা চিঠি আসিয়াছে। প্রশ্নটা করিয়া ফেলিয়াই সমর লজ্জিত হইল। ললিতা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, কাল ত মার চিঠি এসেছে—আবার আজ? তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো!

সমর বালিশটা ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, মাথা খারাপ না হওয়াই আশ্চর্য্য। বাব্বাঃ—যা কাজ পড়েছিল আজ। গিয়ে পর্য্যন্ত আর মাথা তোলবার অবসর পাইনি। চিঠি এসেছিল সাহেবের কাছে প্রায় দেড়শ'—অতগুলির জবাব দেওয়া সোজা কথা!

তবু ললিতা সেদিক দিয়া গেল না। সহানুভূতির সুরে কহিল, সাহেবকে বলো না আর একটা লোক রাখতে, তুমি একা মানুষ কত করবে?

তারপর বলিল, চা খাবে এখন? করব?

বিরসকণ্ঠে চক্ষু বুজিয়াই সমর বলিল, করো—

সে যেন ললিতার উপর একটু বিরক্তই হইয়া উঠিল। কথাটা বলিয়া ফেলিলেই ত হয়, এই বা তাহার কি আশ্চর্য্য জেদ! স্বামীর কাছে স্ত্রীর সমস্ত কথাই অকপটে খুলিয়া বলা উচিত। জিজ্ঞাসা না করাটা যেমন সমরের ভদ্রতা, ললিতারও উচিত নিজে হইতেই বলা—

কিন্তু ললিতা কিছুতেই বলিল না। সে তাহাকে চা, জলখাবার দিয়া নিজে প্রসাধন করিতে বসিল। চলিল এটা ওটা খুচরা গল্প। কথা ললিতাই বেশী বলে, সমর শুধু 'হুঁ হাঁ' দিয়া সারে। আর সাধ্যমত সে চিঠিপত্রের কথায় ফিরিয়া আসে। কখনও বলে 'সরকার আবার ডাক টিকিটের দাম বাড়াচ্ছেন' কখনও বা বলে 'কাল মাদ্রাজের এক জায়গায় ডাক লুট হয়েছে, আহা কত লোকের চিঠিপত্র নষ্ট হ'লো!'

কিন্তু তবু ললিতার সে কথা মনে পড়ে না। সে প্রসাধন শেষ করিয়া কলঘরে চলিয়া গেল, তাহার পর রান্নাঘরে ঢুকিবে। ঝি উনানে আঁচ দিয়াছে—এখন আর উপরে উঠিবার সম্ভাবনাও নাই।

সমর মোটা একখানা কেতাবে মন দিল। আধুনিক বিলাতী উপন্যাস, বাজে বকুনীই বেশী তাহাতে, খানিকটা পড়িয়া আর ভাল

লাগিল না। সেটা রাখিয়া একটা বাঙলা মাসিক ধরিল, কিন্তু তাহাতেও ঠিক মন বসিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতে থাকে ঐ একটা কথা—চিঠিখানা কার, কে লিখিল তার স্ত্রীকে।

অবশেষে এক সময় তাহাকে কৌতূহলের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। অন্যায়ই হউক আর লজ্জাকরই হউক—তাহাকে জানিতেই হইবে ব্যাপারটা!

চিঠি জমানো ললিতার একটা রোগ, যেখান হইতে যত চিঠি আসে, সে সবগুলি একটা বড় কাগজের বাক্সে জমাইয়া রাখে। বাক্সটি কোথায় থাকে, তাহাও সমর জানে। আলমারীর মাথায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে বাক্সটা—

সে নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া আলমারীর সামনে দাঁড়াইল। নীচে গা-ধুইবার শব্দ হইতেছে, ঝিও নীচে কাজে ব্যস্ত, উপরে এখন কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই। সমর ধীরে ধীরে বাক্সটা নামাইয়া উপরের ঢাকনিটা খুলিল—খাম, পোষ্টকার্ড—হরেক-রকমের চিঠি সাজানো আছে সেখানে কিন্তু সবই পুরানো, সেই বিশেষ চিঠিটি তাহার মধ্যে নাই।

বাক্সটা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া সে দেরাজের টানাগুলি খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীর প্রসাধনের জিনিষ যে তাকে সাজানো থাকে সেখানেও খুঁজিল; ক্রমে ক্রমে ঘরের সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থানই দেখা শেষ হইল, চিঠিখানার কিন্তু কোথাও পাত্তা মিলিল না। শেষ পর্য্যন্ত মনে হইল যে সে যখন ডাকিয়া চিঠিখানা দেয় ললিতা তখন রান্না করিতেছিল, রান্নাঘরেই তুলিয়া ফেলিয়া রাখে নাই ত?...উপরের বারান্দা হইতে

উঁকি মারিয়া দেখিল ললিতা তখনও কলঘরে, ঝি উঠানে বসিয়া বাসন মাজিতেছে—

নিঃশব্দে নামিয়া আসিল নীচে। রান্নাঘরেও চিঠিটা নাই। তাক-কুলুঙ্গী সবই খুঁজিয়া দেখিল সে, চিঠিখানার চিহ্ন-মাত্র নাই। চিঠি ত মিলিলই না, উপরন্তু অপ্রস্তুতে পড়িতে হইল। কতটা যে সময় চলিয়া গিয়াছে তাহা খেয়াল ছিল না, পিছন হইতে ললিতা আসিয়া পড়িয়া, প্রশ্ন করিল, ওখানে কী হাৎড়াচ্ছ গো?

অপ্রতিভ ভাবে সমর জবাব দিল, একটু আদা খুঁজছিলুম—গলাটা কেমন সুড় সুড় করছে, বোধ হয় সর্দ্দি হবে।

আ আমার কপাল, আদা বুঝি তাকের ওপর থাকে?...ওপরে যাও, আমি আদা দিয়ে আস্‌ছি—

অগত্যা সমরকে চলিয়া আসিতে হইল। চিঠিখানা কোথাও নাই, নিশ্চয়ই ললিতা পড়িবামাত্র সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু কেন? ললিতা ত কখনও কাহারও চিঠি নষ্ট করে না, বিশেষ করিয়া এইখানাই বা ছিঁড়িল কেন? আর, তা ছাড়া, চিঠিটার কথা অমন বার বার সে এড়াইয়া যাইতেই বা চাহিতেছে কেন?

অকস্মাৎ সমরের কপালে ঘাম দেখা দিল। পাখার হাওয়াও যেন যথেষ্ট নয়, এতই গরম বোধ হইতেছে। একটা কুটিল অথচ অস্পষ্ট সংশয় মনের মধ্যে কোথায় দেখা দিয়াছে, সে সংশয় তখনও বিচ্ছিন্ন চিন্তার নীহারিকার মধ্যে যেন সৃষ্টির অপেক্ষায় আছে, তখনও সেটা কল্পনা—তবু তাহার সেই অ-ধর অস্তিত্বটাই এত আকস্মিক, এত অপ্রত্যাশিত যে তাহার আভাস মাত্রেই সমস্ত বুকটা যেন বেদনায়

পিষিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। সে বেদনা সারা দেহ-মনকে অবশ, মূঢ় করিয়া দিয়া যায়।

সমর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার মুক্ত বাতাস চাই, আর এখনই, নহিলে সে বাঁচিবে না!

কিন্তু সে উঠিয়া যেমন খাট হইতে নামিতে যাইবে, আদার কুঁচি একটা রেকাবীতে করিয়া লইয়া ললিতা প্রবেশ করিল। আসন্ন সন্ধ্যার আব্‌ছায়াতেও সমরের মুখের পাণ্ডুরতা ললিতার চোখে ধরা পড়িল। সে দ্রুত কাছে আসিয়া কহিল, তোমার মুখ অত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন গো?…জ্বর টর আসছে না ত!

তার পর কপাল বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, রক্ষে!—গা বেশ ঠাণ্ডা আছে, ঘামও হচ্ছে।…কিন্তু মুখখানা অত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? বিকেল থেকেই দেখছি কি রকম কি রকম—

সমর জোর করিয়া কণ্ঠে স্বর আনিল, ও কিছু না। শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে, একটু বাইরের হাওয়া লাগলেই ঠিক হয়ে যাবে।

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া ললিতা কহিল, না না, সে হবে না, আজ আর বেরোনো হবে না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো, বরং আদা দিয়ে আর এক কাপ চা এনে দিই।…অফিসের অত খাটুনী গেছে, একটু বিশ্রাম করা চাই ত!

কণ্ঠস্বর তেমনিই আকুল। যেমন গত দুই বৎসর ধরিয়া সমর শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ সে আকুলতাও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সে জামাটা গায়ে গলাইতে গলাইতে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, তুমি

ঘুমুতে পারছ না, একটু ফাঁকা হাওয়ায় না গেলে শরীর আরও খারাপ করবে। আমি চট্ ক'রে ঘুরে আসছি—

আঃ—বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে কী মুক্তি, কী শান্তি! বাড়ির বাহিরে আসিয়া সমর যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রগ দুটা দপ দপ করিতেছিল, কান দিয়া তখন বাহির হইতেছিল আগুন, কিন্তু এখন সন্ধ্যার বাতাসে যেন মাথা একটু ঠাণ্ডা বোধ হইল। আছে, পৃথিবীতে বাতাস আছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বোঁ বোঁ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিবার পর একটু ক্লান্তি বোধ হইল। সে কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চের এক ধারে বসিয়া শ্রান্তিতে চোখ বুজিল। কিন্তু এতক্ষণ জোর করিয়া শারীরিক পরিশ্রমের প্রাচীরে মনের মধ্যে যে চিন্তাটাকে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন সেই চিন্তাটাই আবার মাথা তুলিল। আচ্ছা, কে আছে এমন লোক যে, তাহার স্ত্রীকে গোপনীয় চিঠি লিখিতে পারে? যদি তেমন কেহ থাকেই, আগে ত এ হাতের লেখা দেখা যায় নাই—এতদিন সে ছিল কোথায়? অথচ যদি গোপনীয় চিঠিই না হইবে তাহা হইলে ললিতার গোপন করিবারই বা কি দরকার ছিল?

নাঃ—আবার সেই চিন্তা শুরু হইল। সমর অস্থির হইয়া উঠিল। অন্যমনস্ক হওয়া দরকার, নহিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। আচ্ছা, পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকগুলির কথাই শোনা যাক্—

কথা তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়াই বলিতেছেন, এতক্ষণ সমরের

কানে যায় নাই। এবার সে জোর করিয়া মন দিল। একজন আর একজনকে বলিতেছেন, না, ও মেয়েদের চরিত্র পাহারা দিতে না যাওয়াই ভাল। স্বয়ং দেবতারা পারেন নি, মানুষ ত কোন্ ছার!

আর একটি বৃদ্ধ সায় দিলেন, হ্যাঁ। বলি সেই আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের কথা মনে আছে? সে সিন্দুকে পুরে সমুদ্রের মধ্যে রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি! তার চেয়ে চোখ-কান বুজে থাকাই ভাল।

ছি, ছি, এখানেও এই আলোচনা। সমর সেখান হইতে উঠিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিল। ভগবান তাহাকে কী পাপে এই অশান্তি দিলেন, সে কি ঘরে বাহিরে কোথাও শান্তি পাইবে না? সে ত কিছুই এমন করে নাই, শুধু মাধবীকে গোপনে চিঠি লেখে এই কি তাহার অপরাধ? কিন্তু তাহার মধ্যে ত কোন অন্যায় থাকে না। শুধু একটা নির্ম্মল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।...তবে?...

আরও খানিকটা হাঁটিবার পর নিশীথরাত্রির শৈত্যে মাথা যখন আর একটু ঠাণ্ডা হইল, তখন সে একবার ললিতার দিক হইতেও যুক্তি দিবার চেষ্টা করিল। সত্য, ললিতারই বা এমন কি অপরাধ? শুধু একখানা অপরিচিত হাতের চিঠি তাহার কাছে আসিয়াছে, এই ত? কি ব্যাপার, কাহার চিঠি কিছুই সমর জানে না, জিজ্ঞাসাও করে নাই, শুধু শুধু কি একটা নির্ব্বোধ সংশয়ে কষ্ট পাইতেছে সে। ললিতার এত দিনের ভালবাসার, এতদিনের আন্তরিকতার কি কোন মূল্য নাই তবে?

না, এ শুধুই ছেলেমানুষী।

সমর জোর করিয়া বাড়ির পথ ধরিল। শুধু শুধু এতটা সময়

বৃথা কাটিল, আর কি কষ্টটাই না পাইল মনে মনে। আর ঐ বুড়াগুলা যেন কি, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দৃষ্টি হইতে সব রঙ মুছিয়া গিয়াছে, তাই সব কিছুকেই কালো দেখে। সে বাড়ি ফিরিয়া ললিতার সহিত নিজে ডাকিয়া কথা বলিবে। সম্ভব হইলে অপরাধ স্বীকার করিবে।...সে একখানা চলন্ত ট্রামে চড়িয়া বসিল, আর বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তবু—

বাড়ির কাছাকাছি যত আসিতে লাগিল ততই সমস্ত সাধু বুদ্ধি সেই একখানা সরকারী থামের নীচে যেন কোথায় তলাইয়া গেল। মনে হইল ললিতার প্রতি না জানিয়া অবিচার সে করিবে না, তবু তাহার সহিত আগেকার সেই মধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আর রাখা সম্ভব নয়।

ললিতা দ্বার খুলিয়া দিয়া অনুযোগের সুরে কহিল, বেশ লোক যা হোক্। শরীর খারাপ ব'লে এই রাত দশটা অবধি কোথায় কোথায় ঘোরা হ'লো তাই শুনি? আমি এধারে ভেবে মরি। একদিন বুঝি আর আড্ডা না দিলে চলে না!

সমর কোন জবাব না দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিছুতেই সহজ হইতে পারা যায় না যেন! আশ্চর্য্য! ললিতা শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল, ব্যাপার কি তোমার, সত্যিই জ্বর বাধিয়ে বসলে নাকি?

এবার জোর করিয়া সমর সহজ কণ্ঠ আনিল, না না, অনেকটা ঘুরে বেশ ভাল বোধ করছি।

ললিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবু ভাল। কিন্তু তবু মুখের চেহারা তোমার ভাল নয় বাপু, সকাল ক'রে খেয়ে শুয়ে পড়ো—

সমর কহিল, একটু পরে খাবো, এখন বড় ক্লান্ত।

জামা ছাড়িয়া মুখে হাতে জল দিল, তারপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া সে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। আঃ! অনেকটা ঘোরা হইয়াছে, আগে এতটা বোঝা যায় নাই।

ললিতা নীচে তখনও রান্নাঘর সারিতে ব্যস্ত। ভালই হইয়াছে, নহিলে এখনই হয়ত কথা কহিত, আর সে কথার জবাবও দিতে হইত সমরকে। কিন্তু চুপ করিয়াও শুইয়া থাকা যায় না, কী সব ছাই-ভস্ম চিন্তা আসে মনে।

সে হাত বাড়াইয়া সেই ইংরেজী নভেলটাই টানিয়া লইল। কি বাজে কথাই বকিতে পারে এই নূতন লেখকগুলা। না আছে স্পষ্ট কোন বক্তব্য, না আছে কোন গল্প—শুধু বাজে বকুনি পড়া যায় কি করিয়া?......কিন্তু আর কোন বইও হাতের কাছে নাই। অগত্যা সেইখানাই খুলিল—। মাথার কাছেই আলো, শুইয়াই পড়া চলে। অন্যমনস্কভাবে বইখানা খুলিতেই ঠক্ করিয়া একখানা খাম পড়িল তাহার বুকের উপর। সহসা যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ড লাফাইয়া উঠিল। এ কার চিঠি—আরে, এ যে সেই খামখানাই। সেই হাতের লেখা, ললিতারই শিরোনামা। আশ্চর্য্য!

সমর লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। মনে হইতেছে যেন দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিতেছে। হাত কাঁপিতেছে থর থর করিয়া। চিঠিখানা খুলিয়া পড়া যায় না।

চিঠিখানা খুলিতেও যেন সঙ্কোচে বাধে, এত দিনের এত বক্তৃতার পর! অথচ আর নিজেকে সংযত করাও যায় না। সে আঙুল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া খামখানা খুলিয়াই ফেলিল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। ললিতা ছেলেবেলায় যে স্কুলে পড়িত, তাহার নিজস্ব ইমারত উঠিতেছে। টাকার দরকার, সেইজন্য সমস্ত পুরাতন ছাত্রীদের নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিঠি দেওয়া হইতেছে, এক টাকা, দু'টাকা, যা কিছু হয়। সেক্রেটারী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত সেই মর্ম্মে একখানা চিঠি ললিতার নামেও আসিয়াছে।

চিঠিখানা ললিতা বোধ হয় তাহাকে দেখাইবার জন্যই বিশেষ করিয়া তাহার বইয়ের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। পাতলা চিঠি, তাই দুপুর বেলা বইখানা খুলিয়া পড়িলেও তাহার নজরে পড়ে নাই। সে সমস্ত ঘরটাই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, কিন্তু বইখানার কথা মনে হয় নাই একবারও।...

সামনেই তাহাদের বিবাহের দরুণ আয়না-বসানো আলমারীটা বিদ্যুতালোকে ঝক ঝক করিতেছে, আর তাহাতেই প্রতিফলিত অত্যন্ত নির্ব্বোধ একটি মুখের ছবি সমরকে নিঃশব্দে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

সন্ধি

অনেক করিয়া বলিয়া-কহিয়া শ্রীনাথ সেদিন একটু আগে ছুটি পাইল। অলকার বোন্‌ঝির বিবাহ, বিশেষ করিয়া তাহারা বলিয়া গিয়াছে, না যাইলেই নয়। আবার শ্রীনাথকেই লইয়া যাইতে হইবে, তাহাদের লোকাভাব—সুতরাং একটু আগে না গেলে ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হইবে না।

বাহিরে আসিয়া শ্রীনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। সে চাকরীতে অল্পদিনই ঢুকিয়াছে, সুতরাং দাসত্বের সূত্রগুলি সব ঠিক এখনও আয়ত্ব করিতে পারে নাই। অকারণে খোসামুদি করিতে গেলে এখনও কপালে ঘাম দেখা দেয়। ঘণ্টাখানেক আগে বাহির হইবার জন্য বড়বাবুর কাছে কত মিনতিই না করিতে হইল! বড়বাবু ত কত, তিনজন বাবুকে লইয়া ডেস্‌প্যাচ বিভাগ, তাহারই আবার ইন্‌চার্জ্জ। মাহিনা ত এতদিনে সত্তর টাকায় পৌঁছিয়াছে, তাহাতেই কত দেমাক্! হোঃ!

আর একটা বড় গোছের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে গতিটা একটু বাড়াইয়া দিল। সে কিছুতেই বেশীক্ষণ জোরে চলিতে পারে না,

কারণ হাঁটিতে তাহার এখনও কষ্ট হয় দস্তুর মত! সতৃষ্ণ নয়নে একটা প্রায়-খালি ট্রামের দিকে চাহিয়া সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল যে প্রায় একবৎসর হইল সে ট্রামে বা বাসে চড়ে নাই। তবু হাঁটাটা অভ্যাস হইল না, আশ্চর্য্য!

শ্রীনাথ বড় লোকের ছেলে। তাহার উপর একমাত্র ছেলে বলিয়া লেখাপড়ার চাপ কোনদিনই কেহ দেয় নাই, থিয়েটার করিয়া, গান গাহিয়া এবং কিছু-কিছু পরোপকার করিয়াই দিন কাটিয়াছে। কিন্তু সহসা যেদিন মা এবং তাহার এক বৎসরের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন সেদিন সে প্রমাদ গণিল। প্রমাদ গণিবার বিশেষ কারণও ছিল। খবর লইয়া জানা গেল যে তাহার বড়লোক বাবার ভাণ্ডারের তলা অনেক দিনই ফুটা হইয়া গিয়াছিল, তিনি মরিবার সময় বাড়ী-খানা এবং এদিক ওদিকে হাজার কুড়ি-বাইশের বেশী টাকা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

অবশ্য তাহাতেও চলিয়া যাইতে পারিত, যদি সেই অবস্থাই শ্রীনাথ মানিয়া লইত। কিন্তু সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল টাকাটা বাড়াইবার জন্য। ব্যবসা বস্তুটি কি, সে সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই ছিল না, শুধু শুনিয়াছিল যে অর্থ উপার্জ্জনের উহা সহজ পথ। সুতরাং বাইশ হাজার টাকা নগদ ও বিয়াল্লিশ হাজার টাকার বাড়ী যাইতে বৎসর-দুইয়ের বেশী সময় লাগিল না। শ্রীনাথ ব্যবসাটা মন দিয়াই করিয়াছিল তাই, নহিলে এতদিনও লাগার কথা নয়।

টাকা গেল বটে কিন্তু উৎসাহ গেল না। আরও বৎসর-দুই বিভিন্ন পথে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর ব্যর্থ সাধনা করিয়া, অলকার সমস্ত অলঙ্কার

এবং দামী আসবাবপত্র শেষ করিয়া একদিন সে আবিষ্কার করিল যে, তাহার ঘরে সবদিন আর ভাতের চাল পর্য্যন্ত থাকিতেছে না, সে সত্যই নিঃস্ব হইয়াছে।

সে বড় কঠিন দিন। সেদিন আত্মীয়-বন্ধু বান্ধব কেহ কোথাও নাই, স্বপ্ন গিয়াছে ভাঙ্গিয়া—উপার্জ্জনের অন্য কোন পথ পর্য্যন্ত তাহার জানা নাই। অবস্থাপন্ন শ্বশুরও তখন নাই। শালারা সকলেই মাঝারি চাকুরে, তবু তাহাদেরই চেষ্টায় আরও বৎসরখানেক পরে এই সামান্য চাকরীটি মিলিয়াছে। বড় অফিস তাই, অন্য অফিসে নব-নিযুক্ত ডাকবাবুর পক্ষে কুড়িটাকা মাহিনাই যথেষ্ট। এখানে সে তবু প্রথমেই চল্লিশ টাকাতে ঢুকিতে পারিয়াছিল। এই চার পাঁচ বৎসরে গোটা আষ্টেক টাকা বাড়িয়াছেও—

কিন্তু সে কতটুকু! এই শহরে ঘর ভাড়া দিয়া, ছ-তিনটি প্রাণীর ভরণ-পোষণ চালাইয়া আর ট্রাম ভাড়া দেওয়া যায় না। তবু রক্ষা, বেশী ছেলে মেয়ে হয় নাই! এ অফিসে উন্নতির সুযোগ ছিল কিন্তু তাহার জন্য সামান্য কিছু লেখাপড়ার দরকার হয়, সেইখানেই শ্রীনাথের সবচেয়ে ঘাঁটতি। তাহাকে হয়ত এই ডাক-বিভাগেই সারা জীবন কাটাইতে হইবে, কে জানে!

বিগত দিনের ছবি মনের মধ্য দিয়া যত দ্রুত বেগে সরিয়া যাইতেছিল, গতিও হইয়া পড়িতেছিল তত মন্থর। সহসা এক সময় এই কথাটা লক্ষ্য করিয়া শ্রীনাথ আবার চলার বেগটা বাড়াইয়া দিল এবং মিনিট পনেরো পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ীতে পৌঁছিল।

কিন্তু ঘরে পা দিয়া সে দ্বারপথেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। এ কী কাণ্ড! অলকা এখনও কোন আয়োজনই করে নাই। বরং অন্যদিন এমন সময়ে তাহার মাথা-বাঁধা গা-ধোওয়া শেষ হইয়া যায়, আজ সেটুকুও সারা হয় নাই—আলুথালু বেশে জানলার কাছে মেয়েকে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

শ্রীনাথ বাহিরে রান্না করার ঘেরা জায়গাটাতে উঁকি মারিয়া দেখিল। তোলা উনুনটাতেও যথারীতি আঁচ পড়িয়াছে। শ্রীনাথের বুকের ভিতরটা গুর্-গুর্ করিয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিল যে এই ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় ঝড় ওঠারই পূর্ব্বলক্ষণ। কিন্তু তবু সহসা কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। কারণ অলকা আর আগের মত মধুরভাষিণী অলকা নাই। অভাব-অনটন, প্রতিদিনের দারিদ্র্যে সে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কথায় কথায় সে কলহমুখরা হইয়া ওঠে। এক সময় যে কণ্ঠস্বর মনের মধ্যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য সঞ্চার করিত আজ তাহারই তীক্ষ্ণ শব্দে মাথা খারাপ হইয়া যায়—

শ্রীনাথ অনেকক্ষণ পরে ঘরে ঢুকিয়া কোণে ছাতাটা রাখিয়া দিল। তাহার পর জামাটা খুলিয়া কাছে আসিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, অলকা—

মেয়েটা ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল। কিন্তু অলকা কোন উত্তর দিল না। শ্রীনাথ আবার ডাকিল, ওগো শুন্‌ছ!

এবার জবাব আসিল, কী?

সমস্ত লক্ষণই ঝড় ওঠার। কিন্তু ভয় করারও সময় নাই। কোন-মতে মাথাটা চুলকাইয়া শ্রীনাথ কহিল, এখনও তৈরী হ'য়ে নাওনি, ওখানে যাবে কখন্? দেরী হয়ে যাবে যে!

এবার অলকা মুখ ফিরাইল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কোথায় যাবো ?

সে চাহনির দিকে চাহিলে বুকের রক্ত জল হইয়া যায়। ক্ষীণকণ্ঠে শ্রীনাথ কহিল, বুলুর বিয়ে যে! ভুলে গেলে? আমি যে ঐ জন্যে সকাল ক'রে ছুটি নিয়ে এলুম—

জবাব আসিল, তোমার মাথা খারাপ হতে পারে, আমার ত হয়নি!

শ্রীনাথ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বোকার মত প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, কেন ?

কেন! অলকার কণ্ঠস্বর একেবারে সপ্তমে চড়িল, বল্‌তে একটু লজ্জা করল না তোমার! তারা বড় মানুষ, কত সব বড়লোক কুটুম্ব আস্‌বে, আর তার মধ্যে আমি যাবো ক'নের মাসী—ঝিয়ের মত সেজে, না? তোমার ঘেন্নাপিত্তি না থাকতে পারে, আমার ত আছে!

শ্রীনাথ তবু কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া কহিল, কেন, তোমার সেই বেনারসী সাড়ীটা ত আছে—

এবারে অলকা একেবারে বোমার মত ফাটিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া কহিল, এমন নইলে তোমার বুদ্ধি! তোমার ওরকম বুদ্ধি না হ'লে আর আমার আজ এই দুর্দ্দশা হয়! আজ আমার দোরে কত-গণ্ডা ঝি খাট্‌বে, না, আমিই সারা দিনরাত ঝিয়ের মত খাট্‌ছি!...গায়ে এক আনা সোনা নেই, আমি যাবো পাঁচশ' টাকা দামের বেনারসী পরে নেমতন্ন খেতে! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—আক্কেল-বিবেচনার মাথা খেয়ে বসে আছো একেবারে!

শ্রীনাথ আর কথা কহিতে পারিল না। অলকা একাই আরও

খানিকটা বকিয়া একসময়ে চুপ করিল। এরূপ তিরস্কার নূতন নয়, এক-রকম গা-সহা হইয়া গেছে, চুপ করিয়া গেলে খানিকটা পরে অলকাই নরম হইয়া আসিবে মান-ভঞ্জনের প্রয়োজন আর ঘটিবে না। কিন্তু আজ সে-জন্য অপেক্ষা করাও কঠিন। বড়লোক কুটুম্বের বাড়ী দীনবেশে যাওয়াও যেমন অপমানকর, না যাওয়াও তেমনি। তাহারা যে শুধু দারিদ্র্যের জন্যই গেল না, এ কথাটা সকলকার কাছেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।...তাহাদের মুখের সেই করুণা ও অবজ্ঞা মিশানো হাসি শ্রীনাথের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

সে মিনিট-পাঁচেক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে ডাকিল, অলকা!

সে কণ্ঠস্বরে এবার এমনই একটা আত্মগ্লানির সুর ছিল যে অলকা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, কি?

শ্রীনাথ ভরসা পাইয়া অলকার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আমার অপরাধের অন্ত নেই তা জানি, কিন্তু তুমি ত চিরকালই ক্ষমা ক'রে এসেছ মিনু! আজও মানিয়ে নাও কোন রকম ক'রে, নইলে এর পর আর মুখ দেখাতে পারব না যে!

মিনু! প্রথম যৌবনের আদরের ডাক! এ নামে শ্রীনাথ কত-কাল ডাকে নাই।

অলকার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে কোনমতে জবাব দিল, তা ব'লে আমি এ অবস্থায় ওদের বাড়ী যেতে পারব না।

শ্রীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সবই বুঝি মিনু, নেহাৎ তোমাদের দাঁড়াবার আশ্রয়টুকুও ঘুচিয়ে দিয়েছি, তাই, নইলে এক-এক

সময়ে ইচ্ছে করে যে আত্মহত্যা ক'রে এ অপমানের হাত থেকে অব্যাহতি নিই—

অলকা শিহরিয়া উঠিল। শ্রীনাথ তাহার হাতটায় একটু চাপ দিয়া কহিল, সেখানে সোনা-দানা পরে অনেকে আসবে সত্যি কথা, কিন্তু তোমার মত রূপ কার আছে তাই শুনি! সেখানে ত তোমার কাছে সবাইকে মাথা হেঁট করতে হবে!

সজল চোখেই পুনরায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অলকা এবার শ্রীনাথের দিকেই মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমাকে ঠাট্টা হচ্ছে?…চেহারা কী হয়েছে তা কি কোন দিন চোখ মেলে দেখেচ? ভগবান আমাকে সব দিক দিয়ে মেরেছেন তাই, নইলে এমন লাঞ্ছনাও আমাকে সইতে হয়!…ওপরের ঐ মিন্‌সে বলে কিনা 'যেমন হাড়গিলের মত চেহারা তেমনি গলার আওয়াজ!'…উঃ! ভগবান, এত অপমানও লিখেছিলে অদৃষ্টে!

অলকা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীনাথ বাধা দিতে পারিল না, সান্ত্বনার কোন বাক্যও সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এবারে সে সত্যই আঘাত পাইয়াছিল। স্ত্রীকে সে আন্তরিক ভালবাসিত, বিশেষত অলকার অসামান্য রূপ লইয়া তাহার গর্ব্বের সীমা ছিল না। তবে নাকি স্বামী-স্ত্রী ঘর করিতে করিতে পরস্পরের কাছে একটা অভ্যাসের মত হইয়া উঠে, চেহারাটা ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই কিছুদিন পরে আর কোন পক্ষের থাকে না, তাই শ্রীনাথও এতদিন লক্ষ্য করে নাই যে

অলকার চেহারাটা অভাবে ও দৈহিক কষ্টে এতটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। আজ এতদিন পরে সেই অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু অলকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিতেই সে আগেকার মত জোর করিয়া তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইল, মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, মিনু!

অলকা ভগ্নকণ্ঠে খুব চুপি চুপি উত্তর দিল, কি?

শ্রীনাথ কহিল, তুমি অনেকদিনই আমাকে বিশ্বাস করেছ, আজকের দিনটিও একবার করে দেখ। আমি আজ নিজে হাতে তোমাকে সাজিয়ে দেবো, তুমি বাধা দিও না—!

অলকা উত্তর দিল না। কিন্তু শ্রীনাথের কাছে সে উত্তর পৌঁছিল। সে তাহার ললাটে অনেকদিন পরে একটি চুম্বন করিয়া কহিল, আমি একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসছি, তুমি চট্ করে মাথাটা বেঁধে গা-টা ধুয়ে নাও, লক্ষ্মীটি!

অলকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল। শ্রীনাথও পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্রীনাথ ফিরিল কতকগুলি কি জিনিষ কিনিয়া লইয়া; তাহার পর জানলার ধারে অলকাকে সাজাইতে বসিল। সে নিজে যখন থিয়েটার করিত, তখন স্ত্রীলোকের ভূমিকায় নামিত। সেই সময় রূপ-সজ্জায় তাহার খ্যাতি ছিল অসাধারণ, আজ সেই বিদ্যাটাই

সে কাজে লাগাইল। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল কিন্তু শ্রীনাথের হাত থামিল না। হ্যারিকেনের ম্লান আলোতেই কাজ চলিতে লাগিল। অবশেষে এক সময়ে রং করার কাজ শেষ হইল। শেষ 'শেড'গুলি আঁকিয়া দিয়া, পকেট হইতে সরু সরু চার গাছি গিল্‌টির চুড়ি বাহির করিয়া হাতে পরাইয়া দিল, তাহার পর কহিল, তোমার সেই শান্তিপুরের শাড়ীটা বার করো, সেই যে সাধের—

অলকা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই কিংবা কোন বাধা দেয় নাই। সে যেন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। যে শ্রীনাথের সঙ্গে এতকাল ঘর করিয়াছে, এ যেন সে শ্রীনাথ নয়। এতদিনে, অন্তত একটি বিদ্যারও পরিচয় দিবার অবসর পাইয়া, সে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অলকা তাহার নির্দ্দেশ মত তাহাদের পুরাতন কালের একমাত্র আলমারী হইতে সাদা শাড়ীখানিই বাহির করিয়া আনিল। শ্রীনাথ কাপড়ও নিজে হাতে একেবারে হাল ফ্যাশানে পরাইয়া দিল, তাহার পর হাতে একখানা রুমাল গুঁজিয়া দিয়া কহিল, একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও দেখি—

সেই আলমারীর গায়েই পুরানো বিবর্ণ আয়না বসানো। তাহারই সামনে শ্রীনাথ হ্যারিকেনটা উঁচু করিয়া ধরিল, তবু সেদিকে চাহিয়া অলকা নিমেষে মুগ্ধ হইয়া গেল। যেন কেমন করিয়া তাহার বয়সটা দশ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। ঠিক আঠারো বৎসর বয়সে যেমন দেখিতে ছিল সে, এ যেন তেমনিই। তেম্‌নি অসামান্ত রূপ, দেখিলে আর চোখ ফেরানো যায় না। আয়ত চোখে ঈষৎ কাজলের আভাস

দৃষ্টিতে যেন প্রথম যৌবনের স্বপ্নের ঘোর টানিয়া আনিয়াছে। সে মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, এ কী ক'রে করলে গো!

শ্রীনাথ হাসিল। বিজয়ের হাসি, আনন্দের হাসি; তাহার পর কহিল, নাও, এইবার চট্‌পট্‌ সেরে নাও, ওদের গাড়ী দুবার ফিরে গেছে।

তাহার পরের কাজ সামান্যই। খুকীকে সাজাইয়া নিজে একটা ধোওয়া কাপড় পরিতে পাঁচ মিনিট। ঘরে তালা দিয়া দুজনে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

ইহার পরই শুরু হইল অলকার জয়যাত্রা। যে সমস্ত ধনীগৃহিণীর দল করুণা দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের চোখে ফুটিয়া উঠিল ঈর্ষা। ছোকরার দল চঞ্চল হইয়া উঠিয়া অকারণে ঘোরাঘুরি বাড়াইয়া দিল। বুলুর মা ভগ্নী-গর্বে স্ফীতা হইয়া দত্তগৃহিণীকে কহিলেন, মিনুর যে বয়স হয়েছে তা মোটে দেখায় না, না? মনে হয় যেন আর একবার বিয়ে দিয়ে আনা যায়!

দত্ত-গৃহিণী শেষ অবলম্বন ধরিয়া কহিলেন, এত রূপ, দুখানা গয়না পরতে পায় না বেচারী!

কিন্তু দত্ত-গৃহিণীর কন্যাই ফোঁস করিয়া উঠিল, তুমি চুপ করো মা। আজকাল বুঝি তোমাদের আমলের মত জবরজঙ্গ্‌ কতকগুলো সোনার তাল ঝোলানো আছে! এখনকার চালই যে ঐ! মিনুপিসী কি রকম সেজেছে দেখছ না, একেবারে কলেজে পড়া মেয়ে! ওর ওপর গয়না পরলেই বিচ্ছিরি দেখাত!

অগত্যা দত্ত-গৃহিণী চুপ করিলেন। কিন্তু সেদিকে তখন অলকার

কানও ছিল না, সে যেন এক নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকেই পূজা। যেদিকে যায়—সমস্ত পুরুষের চোখ প্রশংসায় ও মেয়েদের চোখ ঈর্ষায় চঞ্চল হইয়া ওঠে। সকলেই তাহাকে কাছে পাইতে চায়, সকলেই দলে টানে। অনেকদিন পরে অলকা সেই বাল্যকালের মত হাসিতে-খুশীতে গল্পে-গানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক আঠারো বৎসর বয়সের মতোই! এতদিনের দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ তাহাকে যে নাগপাশে বাঁধিয়াছিল তাহা যেন কোন্ জাদুমন্ত্রে খসিয়া পড়িয়াছে।

অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল। তিন-চারজনে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। শেষ মুহূর্ত্তেও নানা রকমের অনুরোধ। বিজয়-গর্ব্বের শেষবিন্দু সুধাটুকুও নিঃশেষে পান করিয়া অলকা মোটরের গদীতে মাথা হেলাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।...

খানিকটা নিঃশব্দে কাটিয়া যাইবার পর অপরাধীর মত কণ্ঠে শ্রীনাথ কহিল, তুমি অমন করে নিঃশ্বাস ফেললে আমার বুকের মধ্যে কি রকম করে মিনু!...আমার হাতে পড়ে কত দুঃখই পেতে হচ্ছে তোমাকে, তা আজ যেমন বুঝতে পারলুম এমন আর কোনদিন বুঝিনি। অমন রূপ তোমার, একখানা গয়না অবধি রাখলুম না, আজ কিনা তোমাকে গিল্‌টির গয়না পরে যেতে হ'লো! এর চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল।

অলকা নিবিড়ভাবে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধে মাথা রাখিয়া কহিল, ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই। কে বলেছে তোমার হাতে পড়ে আমি কষ্ট পেয়েছি! চাইনে আমার গয়না। গয়না নেই ব'লে আজ আমার আর কোন ক্ষোভ নেই। তোমাকে যে স্বামী পেয়েছে, তার আর কী চাই?

বেনারসী

ছোট্ট একটি ঘর এবং তাহারই সাম্‌নের একটুকু ঘিরিয়া লইয়া রান্নার জায়গা—এইত নীলিমার গৃহস্থালী কিন্তু তাহাকেই হরিশ আখ্যা দিয়াছিল সাম্রাজ্য! এবং সেইটুকুর জন্যই দিনরাত সম্রাজ্ঞী নীলিমার যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না।

আর বাস্তবিক, যদি প্রত্যেকটি পাঁচফোড়নের শিশি এবং চিনি-রাখা টিনের কৌটাকে দিনের মধ্যে পাঁচবার ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে অবসর মেলাও কঠিন। সারাদিন ধরিয়া সেই সামান্য গৃহের কয়েকটি মাত্র আসবাব ও গৃহস্থালীর উপকরণ নাড়া-চাড়া না করিলে নীলিমার তৃপ্তি হইত না। এক বিছানাই পাঁচ-ছয়বার ঝাড়িতে হইত, কেহ দেখা করিতে আসিলে কিম্বা বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটেরা গল্প করিতে আসিলে তাহাদের বিছানার উপর বসিতে না দিয়া উপায় ছিল না, অথচ একবার কেহ বসিয়া উঠিয়া গেলেই বিছানার চাদরে যে ভাঁজ পড়ে তাহা নীলিমা সহিতে পারিত না। মানুষটি নিজেও খুব ফিটফাট সৌখীন, মাঘ মাসের

O. Henryর গল্পের আভাসে রচিত।

শীতেও সে সন্ধ্যায় রান্না সারিয়া সাবান মাখিয়া প্রত্যহ গা ধুইত এবং যত রাত্রিই হউক্ না কেন, তাহার পর পাতা কাটিয়া মাথা বাঁধিয়া মুখে সস্তা-দামের পাউডার কিংবা স্নো মাখিত!

হরিশ তাহার এই অতিরিক্ত সৌখীনতার বিরুদ্ধে একটি কথাও কোনদিন বলে নাই। বরং ভাবিত যে আহা, এই সব লইয়া যদি ভুলিয়া থাকে ত থাক। আঠার বছর বয়স নীলিমার, এই বয়সে মেয়েরা কত সাধ-আহ্লাদ মিটাইয়া লয়, সে সব ত কিছুই উহার মিটিল না, যেমন করিয়া সুখে থাকে থাক!

হরিশ যখন বিবাহ করিয়াছিল তখন তাহার তেইশ বছর বয়স, নীলিমার মাত্র পনেরো। সেদিন পৃথিবী তাহাদের চোখে কী রঙ্গীনই না ঠেকিয়াছিল। বি-এ পাশ করিয়া এম্-এ পড়িতেছে সে, মন তখন নানা কল্পনার আনন্দে পরিপূর্ণ, সমস্ত সংসার চোখের সাম্‌নে অভিনব দীপ্তিতে ঝল্‌মল্ করিতেছে। হয়ত অত তাড়াতাড়ি বিবাহ করা তাহার উচিত হয় নাই, কিংবা ইচ্ছাও হয়ত ঠিক ছিল না, কিন্তু মা যখন বোনের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া নীলিমাকে দেখিয়া আসিয়া জোর করিয়া ধরিয়া পড়িয়াছিলেন তখন সে বাধাও দেয় নাই; কারণ আর্থিক কষ্ট বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাহাদের কখনই ছিল না, সুতরাং ওদিকটা চিন্তা করিবার কিছু ছিল না। তাহার পর অকস্মাৎ একদিন সব গোলমাল হইয়া গেল! বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই মা মারা গেলেন এবং আরও মাস-চারেক পরেই দাদা লাহোরে বদ্‌লী হইয়া সপরিবারে চলিয়া গেলেন। তাহার উপর পরীক্ষার ফল বাহির হইতে জানা গেল, সে এম-এতে ফেল করিয়াছে।

দাদা যাইবার সময় আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেলেন, খরচা আমি মাসে মাসে তোমায় পাঠাব, তবে পড়াতে আর পারব না। তুমি চাকরী-বাকরীর চেষ্টাই দেখ একটা। আর এ বাড়ীটাও এতটাকা ভাড়া দিয়ে রাখবার দরকার নেই, বাড়্‌তি ফার্ণিচারগুলো বেচে ফেলে তোমরা কোথাও একটা ঘর কিংবা খুব ছোট একটা ফ্ল্যাট খুঁজে নাও।

ইহার পর দাদা ঠিক ছয় মাস তাহাকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া খরচ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি টেলিগ্রাফ অফিসে মোটা মাহিনায় কাজ করিতেন, পঞ্চাশ টাকা তাঁহার পক্ষে কিছুই নয়; এটা তিনি যে কোনওদিন বন্ধ করিবেন, তাহা হরিশ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেইজন্যই সে ঘরভাড়া করিয়া থাকিবার হীনতা স্বীকার না করিয়া একটা ফ্ল্যাটই লইয়াছিল এবং মায়ের সাধের আল্‌মারি-সিন্দুকের মায়াও কাটাইতে পারে নাই। নিজে একটা গোটা-কুড়ি টাকার ট্যুইশনী করিত সুতরাং তাহাদের সংসার একরকম স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু ঠিক ছয়মাস পরে সহসা টাকা আসা বন্ধ হইল। খানদুই চিঠি লিখিয়াও যখন কোন ফল পাওয়া গেল না তখন হরিশ উদ্বিগ্ন হইয়া টেলিগ্রাম করিল। দিন-তিনেক পরে চিঠির জবাব আসিল। দাদার বড় ছেলেটি কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার হোস্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, তাহার ষাট টাকা খরচা, মেয়ে দুটি স্থানীয় ইস্কুলে পড়ে, তাহাদের পড়াশুনার জন্য প্রায় সত্তর টাকা খরচা হয়, আরও পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ের তিনি ভরসা রাখেন সুতরাং তাহাদের 'লেখা-পড়ার' জন্য তাঁহার প্রস্তুত থাকা দরকার। তাহা ছাড়া মানুষের

জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার যে কত অনিশ্চিত সে সম্বন্ধে তাহাদের বাপমাকে দেখিয়াই জ্ঞান হওয়া উচিত—অতএব সেজন্যও, যেমন করিয়াই হউক কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক। ,এমনিই রকমারী অজুহাত দেখাইয়া দাদা লিখিয়াছিলেন যে মাসে মাসে পঞ্চাশটি টাকা করিয়া খরচ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, এই ছয়মাসেই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সে ঋণ শোধ যে কি ভাবে হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

এই আঘাতটা হরিশের পক্ষে যে এত সাংঘাতিক হইবে তাহা বোধ করি নীলিমাও বুঝিতে পারে নাই। সেই দিনই রাত্রি হইতে হরিশের জ্বর-বিকার দেখা দিল। সে যে কী অবস্থা তাহা বোঝাইবার নয়। সেদিনের কথা মনে হইলে নীলিমার আজও জ্ঞান থাকে না। ঘরে ঐ রোগী, ভরসার মধ্যে একটা ঠিকা ঝি, আর নীলিমার তখন মাত্র সতেরো বছর বয়স! নীলিমার বাপের বাড়ীর অবস্থাও খুব খারাপ, তবু সংবাদ পাইয়া তাহার বাবা যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন একটা ফ্ল্যাটে একলা ঐ রোগী লইয়া নীলিমা মুহ্যমান্ হইয়া পড়িয়াছে। দাদাকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, তিনি টেলিগ্রামেই কুড়িটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আর কোন খবর লন নাই। নীলিমা ও তাহার বাবা কোন মতে হরিশকে বাঁচাইয়া তুলিলেন বটে কিন্তু বিপুল ঋণ হইয়া গেল। মায়ের অত সাধের আল্‌মারী, সিন্দুক, টেবিল, বাসন প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াও অর্দ্ধেক ঋণ শোধ হইল না—নীলিমার হারটিও তাহার সহিত চলিয়া গেল। ইহার পর মাসিক আট টাকা ভাড়ায় এই একতলার ঘরটিতে চলিয়া আসিতে হইল এবং প্রাণপণ চেষ্টায় যখন পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনার বর্ত্তমান মাষ্টারীটা সংগ্রহ হইল তখন

আর নীলিমার অলঙ্কার বড় বেশী অবশিষ্ট নাই। প্রাইভেট ট্যুইশান্‌টি অসুখের সময় ছাড়িয়া গিয়াছিল এবং আর যোগাড় করিতে পারে নাই। মাষ্টারী পাইবার পর দুই-একটি ট্যুইশনের সন্ধান পাইয়াছিল বটে কিন্তু নীলিমা তাহার শরীর খারাপ বলিয়া কিছুতে করিতে দেয় নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় নীলিমা মোটেই অসুখী নয়। সে গরীবের ঘরের মেয়ে, বাসন মাজা বা রান্না করার মধ্যে কষ্টকর বা অগৌরবের কিছু সে দেখিতে পাইত না। হরিশ জোর করিয়া মাসিক এক টাকা মাহিনাতে বাসন মাজার একটা ঠিকা ঝি ঠিক করিয়াছিল বলিয়া বরং সে অসন্তুষ্ট, প্রায়ই বলিত, এইত দুটো লোকের বাসন, খামকা এর জন্য ঐ একটা বাজে খরচা! তা ছাড়া ও মাগী যা বাসন মাজে, দেখলে ঘেন্না করে।

কিন্তু এই একটি বিষয়ে হরিশ অবিচলিত ছিল।

গহনা বা দামী শাড়ীর জন্য নীলিমার কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই বলিয়া মনে হয়। সে তাহার নিজস্ব সংসারের মধ্যে একটু পরিচ্ছন্নভাবে বাস করিতে পারিলেই সুখী। কেবল একটি স্থানে একটু দুর্ব্বলতা তাহার ছিল। বিবাহের লাল বেনারসী তাহার ঠিক পছন্দ হয় নাই বলিয়া শাশুড়ী মরিবার মাত্র আট দিন আগে একখানি চাঁপাফুলরঙের জরির উপর রূপালী জরির কাজ করা বেনারসী শাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলেন। সে কাপড়টি কখনও পরা হয় নাই, এমন কি তাহার ব্লাউজ পীস কাটিয়া জামা করানো পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। সেই কাপড়টি নাড়া

চাড়া করিবার সময় একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস সে কিছুতেই চাপিতে পারিত না, এমন কি হরিশের সামনেও না।

তাহার এ বেদনার কথা হরিশ জানিত, কিন্তু সেটা এতদিন পর্য্যন্ত তেমন ভাবে তাহাকে আঘাত করে নাই যেমন সেদিন করিল।

প্রত্যহ সে ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত খানিকটা ঘুরিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিত—এ তাহার চিকিৎসকের নির্দ্দেশ। অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একটু বেশীই দেরী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রথমটা নীলিমার মুখভার এবং ম্লান হাসির ঠিক অর্থটা ধরিতে পারে নাই। তারপর জামাটা ছাড়িয়া নীলিমার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া পরিহাসের সুরে বলিয়াছিল—যেখানে চাকরী করি তারাও 'লেট' মাপ করে নীলু কিন্তু তোমার কাছে মার্জ্জনা নেই। ও ঘরের ঘড়ি দেখে এস বরং—এ-কিঙ্করের কুড়িটি মিনিটের বেশী দেরি হয় নি।

নীলিমাও পরিহাসের সুরেই জবাব দিল—নিশ্চয়ই না, আটটা-নটা কখন্ বেজে গেছে।

কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হরিশের সন্দেহ হইল। তারপর ভাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার ছলছল চোখ দুইটি নজরে পড়িল। এ দৃশ্য এতই অভাবনীয় যে কিছুক্ষণ হরিশ, বোধকরি একটা অজানা বিপদের আশঙ্কাতেই, কোন কথা কহিতে পারিল না। তারপর কোনমতে ঢোঁক গিলিয়া প্রশ্ন করিল—কী হয়েছে নীলু?

নীলিমা হাতটা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল—কি আবার হবে। ছাড়, তোমার চা তৈরী করে আনি—

হরিশ তাহাকে জোর করিয়া বুকের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল—

আমাদের ত আর কোথাও কেউ নেই নীলু, তুমি যদি আমার কাছেও কথা গোপন করো তাহলে বাঁচবে কি করে?

এবার আর নীলিমা নিজেকে সামলাইতে পারিল না, তাহার দুই চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার এতদিনের সমস্ত দুঃখ সেদিন যেন আর বাধা মানিতে চাহিল না। তাহার সেই বুকফাটা কান্নার মধ্য হইতে একটু একটু করিয়া হরিশ যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করিল তাহা সংক্ষেপে এই : উপর তলার পারুল তাহার স্বামীর সহিত কোথায় নিমন্ত্রণে যাইতেছিল বিবাহের বেনারসী শাড়ী পরিয়া। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় নীলিমার সহিত দেখা হয়, এবং দুই একটি খুচরা আলাপের মধ্যে নীলিমা একবার কাপড়টা পরীক্ষা করিবার মানসে আঁচলটি তুলিয়া ধরিতেই পারুল বলিয়াছে—হাতে তেল ছিল না ত ভাই? দামী কাপড়, একবার দাগ ধরলেই মুস্কিল। দাম ত বড় সোজা নয়, তেতাল্লিশ টাকা নিয়েছে!

কথাটা সামান্য, কিন্তু তাহার আঘাত যে কত সুগভীর তাহা হরিশের বুঝিতে বাকী রহিল না। সে নিঃশব্দে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল, কিন্তু নীলিমার চোখের উষ্ণ জল তাহার বুকের উপর যেখানটায় পড়িতেছিল সেইখানটা ভিতরে ভিতরে যেন উগ্র দাহনে পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

নীলিমাই একটু পরে মুখ তুলিয়া বলিল—তোমরা গায়ে-হলুদে যে কাপড়টা দিয়েছিলে সেটার শুনেছি প্রায় দেড়শ' টাকা দাম, আর ঐ নতুন বেনারসীটা ত আমার সামনেই কেনা, বড়ঠাকুর নিজে আশী-টাকা গুণে দিয়েছিলেন; আমাকে ও তেতাল্লিশ টাকার কাপড় দেখায়!

হরিশ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—ও কাপড় এখন আশীটাকা বললে ওরা বিশ্বাস করবে না। আমরা আট টাকার ঘরে থাকি যে!

স্বামীর কাছে কান্নাকাটি করিয়া বুকের ভার অনেকখানি লাঘব হওয়ায় নীলিমা শীঘ্রই আবার সহজ হইয়া উঠিল, এবং দুই-একদিনের মধ্যেই কথাটা ভুলিয়া গেল। কিন্তু এত সহজে ভুলিতে পারিল না হরিশ। এত বড় অবস্থান্তরেও যে স্ত্রী কোনদিন এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করে নাই, তাহাব এই অপমান হরিশের বুকে নিদারুণ ভাবেই বিঁধিল। কিন্তু উপায় কি? তখনও কাপড়টার ব্লাউজ পর্য্যন্ত তৈয়ারী করা হয় নাই; ইতিপূর্ব্বেই হরিশ দুই একটি দর্জ্জির দোকানে খোঁজ লইয়াছিল, আড়াই টাকার কমে কেহ জামা তৈয়ারী করিতে রাজী হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, কাপড় পরিয়া নীলিমা যাইবে কোথায়? হরিশ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হইতে অজ্ঞাতবাস করিতেছিল, এ অবস্থায় কোন আত্মীয়ের সহিত সম্পর্ক রাখা সম্ভব নহে।

একমাত্র উপায় হইতেছে সিনেমায় যাওয়া। কিন্তু অত দামী কাপড় পরিয়া ন' আনার সীটে বসা যায় না, অন্ততঃ একটাকা দু'-আনার টিকিট কাটিতে হইবে। সেও দুজনকার দু টাকা চার আনা। তাহার পর যাইবার সময়ে ত ট্যাক্সী করিয়া যাইতে হইবে? তাহাও কোন্ না টাকা-খানেকের ধাক্কা! সুতরাং হরিশ বহু হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে টাকা ছয়-সাত খরচা না করিলে কিছু করা যাইবে না।

অথচ তাহার বর্ত্তমান আয়ে মাসে চার আনা পয়সাও বাঁচে না। নীলিমার মাথার দিব্য দেওয়া আছে—সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়াই-

যাবারও উপায় নাই। ছয় সাতটা টাকা তাহার কাছে দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কি?

দিন-পনেরো ধরিয়া চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ একটা উপায় হইয়া গেল। ফার্স্ট ক্লাসের একটি ছেলে তাহার কাছে টিফিনের সময় মাস-তিনেক একটু আধটু দেখাইয়া লইতে চাহিল। সে গরীবের ছেলে, রীতিমত মাষ্টার রাখিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু দু-একটা বিষয়ে সে নিতান্তই কাঁচা। হরিশ যেন অন্ধকারে সহসা আলো দেখিতে পাইল, সে ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল—তা কিছু ত দিবি, কত দিবি বল্ দেখি?

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—টাকা-তিনেক হ'লেই ভাল হয় স্যর!

হরিশ খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া কহিল—দেখ্ তিনটাকা করে হ'লে তোর তিনমাসে ন'টাকা হয়, কিন্তু আমি তিনমাসে সাত-টাকাই নিতে রাজী আছি, যদি এই মাসকাবারে সাতটি টাকা আগাম দিস্—ভাল ক'রে ভেবে দেখ।

ছেলেটি তাহার অভিভাবকের সহিত কথা কহিয়া এই অদ্ভুত প্রস্তাবেই সম্মত হইল। হরিশ ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া প্রত্যহ দিন গণিতে লাগিল, মাসকাবারের আর কত দেরী।

কিন্তু ইহারই মধ্যে বিধাতা অলক্ষ্যে আর একটি পরিহাস করিলেন।

হরিশের ঘড়ি ছিল না, তাহার নিজের হাত-ঘড়িটি অসুখের সময়েই বিক্রি হইয়া গিয়াছিল। বোতাম ও ঘড়ি থাকিতে নীলিমার কোন গহনা বিক্রয় করিতে কোন মতেই সে সম্মত হয় নাই। প্রথম প্রথম ঘড়ি যাওয়াতে খুবই অসুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে তাহা

সহিয়া গিয়াছিল। সামনের বড় ঘরের ভাড়াটেদের ঘড়ি দেখিয়া সে ইস্কুলে যাইত। ইতিমধ্যে সেই ঘড়িটা সারিতে যাওয়ায় উপ্‌রি-উপ্‌রি তিন-চার দিন হরিশের লেট্‌ হইয়া গেল, এবং হেডমাষ্টার মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

হরিশ ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া কথাটা নীলিমাকে জানাইয়া কহিল—কাল থেকে খুব সকাল ক'রে ভাত দিও, একঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকতে হয় সেও ভাল।

নীলিমা বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে তাহার পাশে বসিয়া থাকিয়া তাহার বাঁ হাতের কব্জিটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিল—তখনই তোমায় বলেছিলুম যে ঘড়িটা থাক—তা তুমি ত শুনলে না।... এখনও তোমার কব্জির এ-জায়গাটা ফরসা রয়েছে, ঘড়ির দাগ মিলোয়নি।

তাহার পর কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই কহিল—আচ্ছা কত টাকা হ'লে তোমার ঘড়ি হয়?

হরিশ ঠাট্টা করিয়া কহিল—কেন, কিনে দেবে নাকি? তাহার পর বলিল—সে অনেক টাকা। চলনসই ঘড়ির মধ্যে জন্‌-ব্যারেলটা মন্দ নয়, তা তাতেও অন্ততঃ চোদ্দ-পনেরো টাকা পড়বে—

নীলিমা আর কোন কথা কহিল না।

ইহার দিন-চারেক পরেই হরিশ একদিন সকাল করিয়া ইস্কুল হইতে ফিরিয়া কহিল—ওগো, তোমার সেই কাপড়টা বার করো ত, 'পাঁস্‌'টা কেটে নিই—

নীলিমা যেন সহসা চম্‌কাইয়া উঠিল, কহিল—কাপড়! কি কাপড়?

অসহিষ্ণুভাবে হরিশ কহিল—আহা, ঐ যে তোমার সেই নতুন বেনারসীটা। শিগ্‌গির বার করে দাও, দর্জ্জিকে দিয়ে আসি; তা নইলে পরশুর মধ্যে সে দিতে পারবে না।.

নীলিমা ভয়ে ভয়ে কহিল—কিন্তু সে যে অনেক খরচ, টাকা পাবে কোথায়?

রহস্যজনক ভাবে হাসিয়া হরিশ কহিল—সে তখন দেখা যাবে।

নীলিমা তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া কহিল—আচ্ছা সে হবে এখন। এখন একটু ব'স ত, একটু সুস্থ হও তারপর দেখা যাবে।

বিছানার উপর বসাইয়া জামাটা খুলিয়া লইয়া খানিকটা বাতাস করিল, তাহার পর কি জানি কিসের কৌতুকে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—ত্থাখো একটা কাজ করেছি, বলো রাগ করবে না।

হরিশ বিস্মিত হইয়া কহিল—কি কাজ?

ছেলেমানুষের মত ঘাড় নাড়িয়া নীলিমা কহিল, আগে বলো যে রাগ করবে না। তোমার হু'টি পায়ে পড়ি, কিছুতেই তুমি রাগ করতে পারবে না—

হরিশ আরো আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিছুতেই আমি যে রাগ করি না তোমার ওপর তা ত তুমিই জানোই, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

নীলিমা তখন ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বুকের কাছ হইতে একটি সুদৃশ্য সুন্দর বাক্স বাহির করিল, তাহার পর সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল—আজ তোমার জন্মতিথি, মনে নেই?

বাক্সটি খুলিতেই ভিতরের ভেলভেটের উপর সুরক্ষিত. সুন্দর

ক্রোমিয়ামের ঘড়িটি ঝিক্‌-ঝিক্‌ করিয়া উঠিল। প্রথমটা সেদিকে চোখ পড়িতেই মুহূর্ত্তের জন্ত হরিশের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু ঘড়ির নামটা দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল! ব্যাকুল-ভাবে নীলিমার হাতের চুড়ি কয়গাছির দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া সে কহিল—কিন্তু এ যে অনেক দাম নীলু, এ কি ক'রে পেলে তুমি?

নীলিমা হাসিয়া কহিল—ভয় নেই, আমি চুড়ি বেচিনি।

হরিশ কহিল—তবে? এযে অন্ততঃ ত্রিশ-বত্রিশ টাকার খেলা।

বিস্ময়ে চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া নীলিমা জবাব দিল—ঠিক বলেছ ত? বত্রিশ টাকাই নিয়েছে। পারুলের বরকে দিয়ে আনিয়েছি, ও ঘড়ির দোকানে কাজ করে কি না?

হরিশ কহিল—কিন্তু টাকাটা এল কোথা থেকে—

নীলিমা তাহার কোঁচার কাপড়টা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে নতমুখে কহিল—সেই নতুন বেনারসীখানা বেচে ফেলেছি—

উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হরিশ কহিল—কী বেচেছ? বেনারসী? সেই নতুনটা…

নীলিমা কতকটা অসংলগ্নভাবে কহিল—তুমি রাগ করবে না বললে যে।… কি আর হ'ত, ওটা কবেই বা পরতুম বলো? তার চেয়ে এই ভাল হ'ল। কিরণ পিসির বোন্‌ঝির বিয়ে, তিনি কাপড় বাচাই ক'রে আনিয়ে আমাকে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়েছেন। কাপড়খানা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে।

তাহার পর সহসা নিবিড়ভাবে হরিশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—আর সেই যে টনিকটা, তোমায় ডাক্তার খেতে বলেছিল, সেটাও এক বোতল আনিয়ে রেখেছি। এইবার ওটা তোমায় নিয়মিত খেতে হবে

তা বলে দিচ্ছি। বাকী টাকা ক'টা বাজে খরচ করতে আমি কিছুতেই দেব না—

হরিশ বিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিল।

শেষ